জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপায়নের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ের এমফিল ডিগ্রির শর্ত পূরণের জন্য দাখিলকৃত গবেষণাপত্র

গবেষক

সারা মনামী হোসেন

রেজি নং ০২৬৭/ ২০১৭- ২০১৮

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপায়নের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ের এম.ফিল ডিগ্রির শর্ত পূরণের জন্য দাখিলকৃত গবেষণাপত্র

গবেষক

সারা মনামী হোসেন

রেজি নং ০২৬৭/ ২০১৭- ২০১৮

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. কাবেরী গায়েন

অধ্যাপক

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন, ২০২১

ঘোষণাপত্র

আমি, সারা মনামী হোসেন, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, *জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপায়নের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ* শীর্ষক গবেষণাটি আমার নিজের কাজ। আমার জানামতে, এ শিরোনামে কোনো গবেষণা ইতোপূর্বে সম্পাদিত হয়নি। এম.ফিল ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত এ গবেষণাটি অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে এর আগে প্রকাশিত হয়নি।

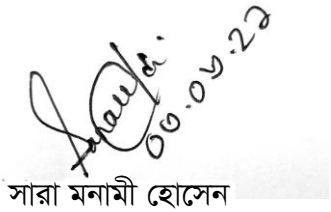

সারা মনামী হোসেন
রেজি নং ০২৬৭/ ২০১৭- ২০১৮
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ও
সহকারী অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিন
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সারা মনামী হোসেন কর্তৃক উপস্থাপিত *জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপায়নের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ* শীর্ষক গবেষণাটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই গবেষণাটি বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

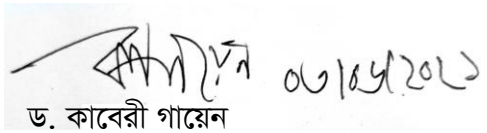

ড. কাবেরী গায়েন
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার মা

নার্গিস সুলতানা

যিনি আমাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে গেছেন

এবং

আমার স্বামী

মুহাম্মদ আবুল হোসেন

যিনি একজন বন্ধুর মতো পাশে থেকে অধ্যাপনা ও গবেষণায় উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ গবেষণা সূচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারার জন্য আমি প্রথমেই আমার বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. কাবেরী গায়েনের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাকে তাঁর মূল্যবান সময় দিয়েছেন। আন্তরিকতা এবং ধৈর্য্যের সাথে তিনি গবেষণাটি সম্পন্ন করতে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর নির্দেশনা ছাড়া গবেষণাটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে কঠিন ছিল। এমন একজন দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ গবেষক এবং শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। তিনি এমন একটি সময়ে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন যে সময়ে গবেষণাটি সম্পন্ন করতে পারব কিনা তা নিয়ে আমি শঙ্কায় পড়ে গিয়েছিলাম। সেজন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাই ড. ফাহমিদুল হককে। গবেষণাটি যখন আমি শুরু করি তখন তিনি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের কিছুদিন পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পান। এ সময় একজন দায়িত্বশীল শিক্ষক মতো তিনি বিভাগের চেয়ারপারসন ড. কাবেরী গায়েনের কাছে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। এ ছাড়া এম.ফিল ডিগ্রির প্রথম বছরের তত্ত্বীয় কোর্সের অংশ হিসেবে তিনি ড. কাবেরী গায়েনের সাথে *গবেষণা পদ্ধতি* কোর্সটির শিক্ষক ছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর পাঠদান, বিভিন্ন বই, জার্নাল ও তথ্যচিত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন, যা আমার গবেষণার নানা পর্যায়ে কাজে লেগেছে। এ জন্য ড. ফাহমিদুল হককে ধন্যবাদ জানাই।

এম.ফিল প্রথম বর্ষে বিভাগীয় শিক্ষক ড. নাদির জুনাইদ ও ড. আবুল মনসুর আহাম্মদের পাঠদান ও বই সম্পর্কিত পরামর্শ গবেষণার ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে। এজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণার কিছু পর্যায়ে আমাকে বিভাগীয় শিক্ষক সাইফুল হক মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। যা আমার গবেষণার কাজকে বেশ সহজ করে দিয়েছে।

বিভাগের সেমিনারের দায়িত্বে থাকা রেজাউল হাসান আখন্দ বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করতে অনেক সাহায্য করেছেন। পাশাপাশি বিভাগের অফিস কর্মকর্তা মো. রিয়াজুল হক, নাজমুল ইসলাম, শেখ হাসান আলী, আলী হোসেন, নাজমা বেগম প্রমুখ কর্মচারীরা নানাভাবে সহযোহিতা করেছেন। তাদের এজন্য ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে, ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার পরিবারের সদস্যদের, যাদের আন্তরিক সমর্থন ছাড়া গবেষণার কাজটি পরিচালনা ও সম্পন্ন করা কঠিন ছিল। তাঁদের ভালোবাসা ও উৎসাহ আমাকে আগামী দিনেও ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

সারা মনামী হোসেন
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ঘোষণাপত্র	.....	III
প্রত্যয়নপত্র	.....	IV
উৎসর্গ	.....	V
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	.....	VI

অধ্যায় পরিকল্পনা

প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা	১-১২
	১.১ ভূমিকা	১-৯
	১.২ প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞা	৯
	১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য	৯-১০
	১.৪ গবেষণা প্রশ্ন.....	১০
	১.৫ গবেষণা যৌক্তিকতা	১০-১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা ও তাত্ত্বিক কাঠামো	১৩-২৫
	২.১ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা	১৪-১৬
	২.২ তাত্ত্বিক কাঠামো	১৬-২৫
	২.২.১ শ্রেণি তত্ত্ব	১৬-১৮
	২.২.২ বর্ণন তত্ত্ব	১৯-২০
	২.২.৩ রেপ্রিজেন্টেশন	২০-২১
	২.২.৪ সেমিওলোজি	২২-২৩
	২.২.৫ ডিসকোর্স	২৩-২৫
তৃতীয় অধ্যায়	গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনায়ন	২৬-৭০
	৩.১ গবেষণা পদ্ধতি	২৭
	৩.১.১ নমুনায়ন	২৭-২৮
	৩.২ বিশ্লেষণের একক	২৮
	৩.৩ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	২৮
	৩.৪ তথ্য (চলচ্চিত্র) বিশ্লেষণ	২৮-৭০
	৩.৪.১ *কখনো আসেনি* (১৯৬১)	২৯-৪১
	৩.৪.২ *আনোয়ারা* (১৯৬৭)	৪১-৪৯

Dhaka University Institutional Repository

	৩.৪.৩ *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০)	৪৯-৫৭
	৩.৫ সেমিওটিক বিশ্লেষণ	৫৭-৭০
	৩.৫.১ *কখনো আসেনি* (১৯৬১)	৫৭-৬১
	৩.৫.২ *আনোয়ারা* (১৯৬৭)	৬২-৬৬
	৩.৫.৩ *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০)	৬৬-৭০
চতুর্থ অধ্যায়	৪.১ ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	৭১-৮০
পঞ্চম অধ্যায়	ফলাফল, সুপারিশ ও উপসংহার	৮১-৮৬
	৫.১ ফলাফল	৮২-৮৫
	৫.২ সীমাবদ্ধতা ও সুপারিশ	৮৫-৮৬
	৫.৩ উপসংহার	৮৬
তথ্যসূত্র	.....	৮৭-৯৩

Dhaka University Institutional Repository

সারাংশ

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসের একজন সৃজনশীল ও কালজয়ী ব্যক্তিত্ব জহির রায়হান। তরুণ বয়সে একজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে পরিচিত করলেও পরে তিনি চলচ্চিত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। একজন চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্যকার ও প্রযোজক হিসেবে চলচ্চিত্র এবং প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও প্রযোজনা করেছেন তিনি। এ ছাড়া বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু-তিন ভাষাতেই তিনি চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। এর পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাও চালিয়ে গেছেন। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে।

এই গবেষণার উদেশ্য ছিল জহির রায়হান নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোতে কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবন কোন শ্রেণি প্রশ্নে দেখা হচ্ছে সেটি আলোচনা করা। কারণ একজন সৃষ্টিশীল মানুষের সৃষ্টিকে সম্যকভাবে জানতে হলে তাঁর শ্রেণি অবস্থান জানা জরুরি। সৃষ্টিশীল মানুষ বা শিল্পী তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনতে পারেন। তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজ সচেতনতার প্রকাশ ঘটে। সমাজ ও ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে। একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ও বাঙালি মুসলমান চলচ্চিত্রকার হিসেবে জহির রায়হানের শ্রেণি ঝোঁক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কিত ধারণা তাঁর সমাজ সচেতনতার একটি প্রতিফলন।

গবেষণাটি একটি গুণগত গবেষণা। এই গবেষণার মাধ্যমে জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপায়নের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ৬০ ও ৭০-এর দশকের তিনটি চলচ্চিত্র নির্বাচন করে ডিসকোর্স বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সেখানকার চরিত্রগুলোর সংলাপ, ইমেজ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জহির রায়হানের নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর মাধ্যমে শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই শ্রেণিটিকে তিনি তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষাপটে ক্ষমতাবান করে তুলেছেন। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী জহির রায়হান শ্রমিক শ্রেণিকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। তাদের মধ্যবিত্তের অধীন করে তুলেছেন। অর্থাৎ নিম্নবিত্তকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হিসেবে উপস্থাপন করে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে শাসকশ্রেণির পাশে থেকে কাজ করার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপায়নের আলোচনায় জহির রায়হান তাঁর শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত সত্ত্বাকে জিইয়ে রেখেছেন। শ্রেণিহীন সমাজের মতাদর্শকে ধারণ করলেও চলচ্চিত্রের মতো একটি শক্তিশালী মাধ্যমে তিনি তার প্রতিফলন ঘটাতে পারেননি। এর কারণে তাঁর চলচ্চিত্রগুলোতে শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি পুরো ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে গেছে।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

১.১ ভূমিকা

চলচ্চিত্র সম্পর্কে রায়হান (১৯৬৭) বলেছিলেন,

> সিনেমা হলো কবিতা
> সিনেমা হলো উপন্যাস
> সিনেমা হলো সংগীত
> সিনেমা হলো পেইন্টিং
> সিনেমা হলো নাটক
> সিনেমা হলো বিজ্ঞান
> সিনেমা হচ্ছে সবকিছুর সমষ্টি। এ এক যৌথকলা। অথচ কোন একটির একক অস্তিত্ব এখানে নেই। সবকিছুকে ভেঙেচুরে, সবকিছুর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা।[১]

৫০-এর দশকের শেষ ও ৬০-এর দশকের শুরু থেকে জহির রায়হান চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। এ বিষয়ে ইসলাম (২০০৯) বলেন, তাঁর কয়েকটি চলচ্চিত্র বাণিজ্যিক হলেও অধিকাংশে উঠে এসেছে সে সময়কার রাজনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার নানা চিত্র। কবির (২০১৮) জহির রায়হান সম্পর্কে বলেন,

> শিল্পীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে সে ছিল সদা সচেতন। সে বিশ্বাস করত যে শিল্পীর মহান দায়িত্ব হল আপামর জনসাধারণকে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, যাতে করে একদিন সত্যিকারের ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠের সত্যিকারের প্রতিনিধিদের হাতে আসতে পারে বিপ্লবের মাধ্যমে (কবির, ১৯৮১/২০১৮: ১৫১)।

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে জহির রায়হান একজন প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্যকার ও প্রযোজক ছিলেন। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। হায়াৎ (২০০৭) জানান, ১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট জন্মগ্রহণ করা এই মানুষ ১৯৫৭ সাল থেকে চলচ্চিত্র পরিচালনা ও রচনায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি সামাজিক, লোককাহিনি ভিত্তিক ও রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। তাঁর পরিচালনায় ৯টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। যুগ্ম পরিচালনায় নির্মাণ করেছেন একটি চলচ্চিত্র। ওই ৯টি চলচ্চিত্রের মধ্যে তিনটির গান তিনি রচনা করেছেন আর তিনটির চিত্রনাট্যও রচনা করেন। দুইটি চলচ্চিত্রের তত্ত্বাবধানের কাজে জড়িত ছিলেন। এ ছাড়া তাঁর পরিচালনায় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তি পায় প্রামাণ্যচিত্র *স্টপ জেনোসাইড* ও *এ স্টেট ইজ বর্ন*। পশ্চিম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের কাহিনি নিয়ে তিনি প্রামাণ্যচিত্র দুইটি তৈরি করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি একই বছর দুইটি প্রামাণ্যচিত্র প্রযোজনা করেন। এর আগে ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে তিনি চারটি চলচ্চিত্রে সহকারি পরিচালক হিসেবে কাজ করেছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি *লেট দেয়ার বি লাইট* নামের একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেও তা শেষ করে যেতে পারেননি। জহির

[১] ১৯৬৭ সালে *তরঙ্গ* পত্রিকায় চলচ্চিত্র সম্পর্কে লিখেছিলেন জহির রায়হান। ২০১৭ সালে *সাপ্তাহিক একতা*- তে এটি পুর্নপ্রকাশিত হয়।

রায়হানের আরেকটি বিশেষত্ব হলো তিনি বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু- তিনটি ভাষায় চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে জহির রায়হান অনন্য আরেকটি কারণে যে তিনি লেখালেখি ও চলচ্চিত্র নির্মাণ একই সঙ্গে চালিয়েছেন। জাহান (উদ্ধৃত হায়াৎ, ২০০৭: ১৩) বলেন, ছাত্রজীবন থেকে এ পরিচালক লেখালেখি করতেন। সাংবাদিকতা করার সময়ও তাঁর সাহিত্যচর্চা চালু ছিল। এদিকে পাশাপাশি তিনি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের সময় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার কারণে একবার এরপর ১৯৫৫, ১৯৫৭ সালেও তিনি কারাবরণ করেন। জেলখানায় বসেও তাঁর লেখা বন্ধ হয়নি। হায়াৎ (২০০৭) বলছেন, ৬০- এর দশকে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে যে গণআন্দোলনের সূচনা ঘটে শিল্প ও সাহিত্য অঙ্গনেও তার প্রভাব পড়ে। যাতে জহির রায়হানও জড়িয়ে পড়েন। তাঁর প্রতিটি উপন্যাস, গল্প ও চলচ্চিত্র একটির চেয়ে অন্যটি আলাদা।

তিনি শহুরে ও গ্রামীণ পটভূমিতে লিখেছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, রোমান্টিক প্রায় সব ধরনের লেখনিতে মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। একই বৈশিষ্ট্য তাঁর চলচ্চিত্রেও দেখা যায়। নিজের গল্প থেকেও তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। এ ছাড়া চলচ্চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তিনটি ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি প্রথম রঙিন ছবি ও প্রথম সিনেমাস্কোপ চলচ্চিত্র তাঁর হাত ধরে নির্মিত হয় বলে জানান হায়াৎ (২০০৭)। তাঁর একটি বিশেষ পরিচয় হলো তিনি রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকার। সমাজতন্ত্রকে আর্দশ হিসেবে নিলেও ৬০- এর দশকে জহির রায়হানের জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে। হায়াৎ (২০০৭) জানান, প্রথম তিনটি চলচ্চিত্র বক্স অফিসে সফল না হওয়ার কারণে অর্থ সংকটে পড়ে বাণিজ্যিক ছবি নির্মাণ করেন। পরে সামরিক সরকারের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জনমানুষকে সচেতন করতে এবং জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে তৈরি করেন *জীবন থেকে নেওয়া* চলচ্চিত্র, *স্টপ জেনোসাইড* ও *লেট দেয়ার বি লাইট*- এর মতো তথ্যচিত্র। *জীবন থেকে নেয়া*-কে বলা হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ছবি। রূপক আকারে তিনি বাঙালির মুক্তি সংগ্রামকে ফুটিয়ে তোলেন। এ ছাড়া ভাষা আন্দোলন নিয়ে তিনি উপন্যাস লিখেছিলেন, গল্প রচনা করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি চলচ্চিত্র নিমার্ণের কথা ভাবলেও পরে তা আর হয়ে ওঠেনি।

মজিদ (২০২০)- এর মতে, একুশ, একাত্তর আর জহির রায়হান- এ শব্দগুলো একে অন্যের সাথে জড়িয়ে আছে। একুশে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন, একাত্তরে ক্যামেরা নিয়ে চলচ্চিত্রযুদ্ধে নামেন এবং বর্হিবিশ্বে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতার খবর ছড়িয়ে দেন। আর হাননান ও রানু (১৯৯৮) বলেন, তিনি আদর্শ ও চেতনার প্রতীক। বাংলাদেশের জন্মলাভের ইতিহাস জানতে হলে জহির রায়হানকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। কারণ তাঁর নামের সাথে জড়িয়ে আছে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস। তিনি চলচ্চিত্রে নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধারণ করেছেন এবং বৈচিত্রপূর্ণ কাহিনির মাধ্যমে সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। ফলে একজন রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকার হিসেবে, একজন প্রগতিশীল চলচ্চিত্রের পুরোধা হিসেবে জহির রায়হান অদ্বিতীয় হয়ে আছেন।

আগেই বলা হয়েছে, চলচ্চিত্র নির্মাণের পূর্বে ও নির্মাণ করা অবস্থায় তাঁর গল্প ও উপন্যাসে সব সময় মানুষের প্রাত্যহিক সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক চেতনা দেখা গেছে। জহির রায়হানের প্রথম উপন্যাস *শেষ বিকেলের মেয়ে* (১৯৬০)- তে আছে শ্রেণি চেতনার প্রকাশ। রোম্যান্টিক ঘরানার এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, কেরানি পদে চাকরি করা কাসেদের সাথে মধ্যবিত্ত পরিবারের জাহানারা ও শিউলির মিল হয় না। বরং তার সাথে মেলে

তাদের বাড়িতে আশ্রিত দূর সম্পর্কের খালাত বোন নাহারের মতো মেয়ে। ১৯৬১ সালে জহির রায়হানের প্রথম চলচ্চিত্র *কখনো আসেনি* মুক্তি পায়। এর এক বছর পর লেখেন *তৃষ্ণা* নামের গল্প ও দুই বছর পর লেখেন *হাজার বছর ধরে* নামের উপন্যাস।

তৃষ্ণার কাহিনি আবর্তিত হয় নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের একঘেয়ে জীবনের প্রতি মুক্তির তৃষ্ণা নিয়ে। এতে রূপাকারে সে সময়কার অস্থির পরিবেশে স্বচ্ছল জীবনের আকাঙ্খায় অন্ধকারকে বেছে নেওয়া গল্প আছে, প্রেম ও কামনার মধ্যে নির্ভরশীলতার গল্পও আছে; সেই সাথে আছে মানুষের অধিকার খর্ব হওয়ার চিত্র। আবার *হাজার বছর ধরে* উপন্যাসটি এগিয়ে যায় সামন্তবাদী জীবনের প্রথা, সংস্কার আর যাপিত জীবনকে ঘিরে। জহির রায়হান এরপর ১৯৬৯ সালে লেখেন *আরেক ফাল্গুন* ও *বরফ গলা নদী* নামের দুইটি উপন্যাস। প্রথমটি ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে একুশে পালন করা একদল তরুণ-তরুণীর গল্প নিয়ে রচিত। সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি দিয়ে শুরু করা কাহিনি ইঙ্গিত দেয়, ন্যায্যতা আদায়ের সংগ্রামে লড়াই করতে থাকা মানুষগুলো সবসময় শাসকদের কাছে 'দেশদ্রোহী'-ই থাকে। তারা এদের দমনের চেষ্টা করে, শাস্তি দেয়। কিন্তু তাতে তরুণেরা আরও সাহসী হয়ে ওঠে। আর *বরফ গলা নদী* উপন্যাসে উঠে এসেছে শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের টানাপোড়ন। নিম্নমধ্যবিত্তের আত্মমর্যাদা, ধনীদের বিলাসি প্রেম আর শেষে নিম্নমধ্যবিত্তের ভাঙাচোরা বাড়িটি ধ্বসে পড়ে একজন ছাড়া পরিবারের সবার মৃত্যু ঘটার মাধ্যমে বলা হয় জীবনের উত্থান-পতনের গল্প।

'৭০ সালে *আর কত দিন* উপন্যাসে আন্তর্জাতিক পরিসরে ধর্ম, বর্ণ, জাতের নামে দ্বন্দ্ব, হানাহানির কথা লেখা হয়েছে। এদিকে একই সালে *একুশে ফেব্রুয়ারি* নামের আরেকটি উপন্যাসে জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনের সময়কার ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন এ আন্দোলনে কেউ বুঝে, কেউ কেউ আবার না বুঝে জড়িয়ে পড়েছিলেন। একই সঙ্গে অন্য পক্ষের বিপরীত চিন্তাও তিনি তুলে এনেছিলেন।

এ বিষয়ে কবির (২০১৩: ৮) বলছেন,

> জহির রায়হানের সে সময়কার লেখা কিছুটা রোমান্টিক ও আবেগবহুল হলেও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রাম তিনি তখনকার গল্প ও উপন্যাসে যথেষ্ট দক্ষতা ও দরদের সঙ্গে এঁকেছেন।

গবেষক হায়াৎ (২০০৭), হাননান ও রানু (২০১৩) প্রমুখের মতে, ভাষা আন্দোলনে যোগদান, সক্রিয় রাজনীতি ও সাংবাদিকতার করার কারণে জহির রায়হানের গল্পে সব সময় জীবনবোধ ও সমাজ চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর বিপ্লবী আদর্শ সম্পর্কে হায়াৎ (২০০৭) বলেন, কিশোর বয়সেই জহির রায়হান বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

জহির রায়হান ৬০-এর দশকে যখন উপন্যাস ও গল্প লেখার পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন তখন সারা বিশ্বে পুজিঁবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে ঘিরে রাজনৈতিক মেরুকরণ তুঙ্গে ছিল। এখান থেকে জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় বিশ্ব। সমাজতন্ত্রের সমর্থনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পুঁজিবাদ সমর্থনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য কাজ করতে থাকে। ফলে দুই

দলের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। এর পরিণতিতে ১৯৬০ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সূচনা ঘটে। সে সময় উত্তর ভিয়েতনামে সমাজতন্ত্র ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ছিল। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানি; সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী আর্দশের ভিত্তিতে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি হিসেবে বিভক্ত হলে ১৯৬১ সালে নির্মাণ করা হয় বার্লিন প্রাচীর । সারা বিশ্বে ওই সময় সমাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তা শুরু হয়েছিল বলা যায় (*দি কোল্ড ওয়ার ১৯৪৫- ১৯৮৯*, তারিখবিহীন, পৃ. ৩-২০)।

এ রকম একটি সময়ে বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও অস্থিরতা চলছিল। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটছিল তখন থেকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মিত্র (১৯৯৭) বলেন, ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনের সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভাঙা-গড়া শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা পূর্ব পাকিস্তানে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বাতিল করে সামরিক শাসন জারি করেন। ইসকান্দার মির্জাকে সরিয়ে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করার পর সব ধরনের রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এরপর শাসন ক্ষমতা পুরোপুরি কেন্দ্রের মুঠোয় নেওয়ার সাথে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার, সংবাদ নিয়ন্ত্রণ, সামরিক শাসনের পক্ষে স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের মতো অবস্থা চলতে থাকে।

হাননান (২০১৩) জানাচ্ছেন, ৬০-এর দশকের এই অরাজক সময়ে জহির রায়হান লিখেছিলেন *শেষ বিকেলের মেয়ে* এবং ১৯৬০ সালে শুরু করেন *কখনো আসেনি* চলচ্চিত্রের নির্মাণকাজ। এদিকে পরের বছর সামরিক শাসনের মধ্যেই শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের আড়ালে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করে। এরমধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় অনেকের সাথে জহির রায়হানকেও গ্রেপ্তার করা হয় । হায়াৎ (২০০৭) এর মতে, এ সময়ে জহির রায়হান লিখছিলেন *হাজার বছর ধরে* এবং বছরের শেষে মুক্তি পায় *কখনো আসেনি* চলচ্চিত্রটি। ১৯৬২ সালে সরাসরি ভোটাধিকার বাতিল করে সামরিক সরকারের অধীনে সংবিধান প্রণীত হওয়ার পর জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক নির্বাচন, আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তারের ফলে ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত, যা একসময় গণআন্দোলন হয়ে ওঠে; সে সময় জহির রায়হান রচনা করেন *তৃষ্ণা*। কাজ করতে থাকেন *কাঁচের দেয়াল* চলচ্চিত্র নিয়ে।

১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে জহির রায়হান বাণিজ্যিক ঘরানার ছবি নির্মাণ করেন- *সঙ্গম* ও *বাহানা*। এরপর ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন যার মূল বিষয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বশাসন। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সৃষ্টি হওয়া উত্তাল পরিবেশে তাঁর চলচ্চিত্র *বেহুলা* (১৯৬৬) মুক্তি পায়। এ ছবিটির বিষয়ে দাস (২০১৭) তাঁর জহির রায়হানের উপন্যাস বিষয়ক গবেষণার একটি অংশে বলেছেন,

> উপনিবেশিক ও নয়া উপনিবেশিক শাসন তথা সাম্রাজ্যবাদী শাসনবিরোধী 'মনসামঙ্গল' কাব্যকে দেব-দেবীদের ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণের সংগ্রাম-সংঘাত এবং সাধারণের আপস ফর্মুলার চিত্রায়ন করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন জহির (দাস, ২০১৭: ১০৭)।

এদিকে '৬৭ সালেও রাজনৈতিক অঙ্গন ব্যতিব্যস্ত। দুই সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বও শুরু হয়, যা এ দেশের বামপন্থীদের মধ্যেও প্রভাব ফেলেছিল বলে দাবি করেন হায়াৎ (২০০৭)। এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্যেই মুক্তি পায় *আনোয়ারা*। যদিও *আনোয়ারা*-তে এ দ্বন্দ্বের কোনো প্রভাব দেখা যায়নি বলে দাবি করেন দাস (২০১৭)।

১৯৬৭ সাল থেকে আবার রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন জহির রায়হান। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তিনি অংশ নিতেন বলে জানা যায়। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশ পায় *অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র* (২০১৭) শীর্ষক লেখায়। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত এ লেখায় তিনি বলেন, অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম না হলে চলচ্চিত্র কখনো চারুকলা হিসেবে স্বীকৃতি পেত না, মানুষ এর শক্তি সম্পর্কে জানতেও পারত না। অক্টোবর বিপ্লবের নেতা লেলিন সেটি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি নতুন সমাজের বাণী পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন এই মাধ্যমকে ব্যবহার করে।

দাসের (২০১৭) মতে, '৬৮-তে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণের মতো ঘটনা তাঁর কাজে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। এ জন্য এর পরের বছর রচিত হয় *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাস। ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময়ে তরুণদের মধ্যে চেতনার বর্হিপ্রকাশ, পাকিস্তানি শাসকদের দমন-নিপীড়ন তিনি তুলে ধরেন। এরপর প্রকাশিত হয় *বরফ গলা নদী*। এক বছর পর, ১৯৭০ সালে জহির রায়হান শুরু করেন *জীবন থেকে নেয়া* চলচ্চিত্রের কাজ। বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবি, সামরিক সরকারের স্বৈরাচার, জনগণের মুক্তির আন্দোলন প্রতীকিভাবে এখানে উঠে আসে ।

> স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে গণমানুষের সংগ্রামের এই চলচ্চিত্রে একদিকে চলে রাষ্ট্রের শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্ত হতে বাঙালিদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রাম, অন্যদিকে সংসারে আধিপত্য বিস্তারকারীর বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রাম। রাষ্ট্র বা পরিবার-কারোর আধিপত্য থেকেই রেহাই মেলে না, যদি নিজের অধিকারের প্রতি সচেতন হয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম না করা যায় (দাস, ২০১৭: ১০৮)।

জহির রায়হানের রাজনৈতিক চেতনার জোরালো প্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাঁর নির্মিত *স্টপ জেনোসাইড* ও *আ স্টেট ইজ বর্ন*- প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে। যা মুক্তিযুদ্ধকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরতে সাহায্য করেছিল। আনিসুজ্জামান (২০১৮) জহির রায়হান সম্পর্কিত একটি তথ্যচিত্রে বলেছিলেন,

> আমি তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি তিনটি প্রগাঢ় ভালোবাসা। একটি তাঁর অগ্রজের প্রতি, একটি তাঁর শিল্পের প্রতি, সর্বোপরি দেশের প্রতি (রায়, ২০১৮: ৩: ০৮ মিনিট)।

হায়াৎ (২০০৭) জানান, ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তিনি নয়টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, যার মধ্যে একটি ছিল যুগ্ম পরিচালনায়। ১৯৭১ সালে নির্মাণ করেন দুইটি তথ্যচিত্র। পরিচালনায় আসার আগে চারটি চলচ্চিত্রের সহকারী পরিচালক ছিলেন।

বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী জহির রায়হানের নির্মিত চলচ্চিত্রে শ্রেণি উপস্থাপনের প্রসঙ্গটি বারবার এসেছে। বিশেষ করে নানা সময়ে গবেষকেরা বলেছেন তাঁর সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপস্থাপন দেখা গেছে। পাকিস্তান আমলে এই শ্রেণি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জহির রায়হানকে নিয়ে লিখিত প্রবন্ধে তালুকদার (২০১৯) বলেন,

> জহির রায়হানের চিন্তার গন্ডি ছিল মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক। জহির রায়হানের উপন্যাস যেমন মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক, তাঁর চলচ্চিত্রও একইভাবে মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক। আসলে তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল মধ্যবিত্তের সঙ্গেই যোগাযোগ স্থাপন করা। সব শিল্পমাধ্যম দিয়ে তিনি কমিউনিকেট করতে চাইছিলেন তৎকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেই (দৈনিক সমকাল, ২০১৯)।

জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গল্প উঠে এসেছে সেই শ্রেণিকে বুঝতে হলে ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। হাননান ও রানু (১৯৯৮)- এর মতে, মধ্যবিত্ত সব সময় নগরকেন্দ্রিক, যাদের ষোল বা সতের শতকে পশ্চিমা বিশ্বে উত্থান ঘটেছিল নতুন একটি অর্থনৈতিক শ্রেণি হিসেবে। পরে ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশে কলকাতাকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাধ্যমে তাদের বিকাশ ঘটে।

বঙ্গদেশের সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন শুরু হয়েছিল ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা ও ১৮৩৫ সালে সরকারি অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে বলে জানান সেন (১৯৮৫)। তাঁর মতে, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় (১৮২৩) এর *কলিকাতা কমলালয়* নামের গ্রন্থে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্তের একটি সামাজিক স্তরবিন্যাস দেখা যায়। এটাকে তিনি তুলনা করেছেন উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের শহুরে সামাজিক স্তরবিন্যাসের আর্দশ নমুনা হিসেবে। বলা হয়, কলকাতার ভদ্রলোক শ্রেণিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়- ব্রিটিশ শাসকদের দাক্ষিণ্যে যারা বড় জমিদার হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় ভাগে লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্টি হওয়া নতুন জমিদারদের নতুন বাঙালি মধ্যবিত্ত হিসেবে দেখানো হয়। এরা উচ্চমধ্যবিত্ত। তৃতীয় ভাগে আছে, চিকিৎসক, শিক্ষক, উকিল, মাঝারি ব্যবসায়ী, সাংবাদিক প্রভৃতি মধ্য- মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। শ্রম ও সম্পদের ভিত্তিতে উচ্চ ও মধ্য মধ্যবিত্ত এই দুই দল বিভক্ত হয়েছে। এরপর আছে নিম্ন মধ্যবিত্ত। এরা পরিশ্রম করে বেশি, কিন্তু আয় করে কম।

ঘোষ (১৯৬৮) বলেন, উনিশ শতকে কলকাতা ছিল প্রশাসন ও বাণিজ্যকেন্দ্রিক। শহুরে মধ্যবিত্ত চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আর গ্রাম্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল জমিদারির উপসত্ত্বভোগী। এক সময় শহুরে জীবনের প্রভাব গ্রামে পড়লে সেখানকার অবস্থা পরিবর্তন হতে শুরু করে। অনেকে গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন শহরে। ব্রিটিশরা মূলত সে সময় তাদের সুবিধার জন্য অনুগত একটি শ্রেণি তৈরির চেষ্টা করেছে। এ জন্য ইংরেজি শিক্ষা অর্জন করে ভালো পদ-পদবীপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সুবিধা বেশি পেয়েছে। এখান থেকেই একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকাশ লাভ করেছে। এরপর ধীরে ধীরে চাকরি পাওয়ার সুবিধা, ব্যবসার সুবিধা ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে মফস্বল ও গ্রামীণ পর্যায়ের স্বচ্ছল লোকেরা ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিল বলে জানান সেন (১৯৮৫)।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির জাগরণ ঘটে। বিভিন্ন সাহিত্য ও লেখক সংঘ পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের মাধ্যমে শ্রেণিটি নতুন মাত্রা পায়। ঢাকা তখন নগর হিসেবে গড়ে উঠছে এবং মুসলমান পরিবারের অনেকে ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। এ বিষয়ে আহমদ (২০০৪) এর বক্তব্যও একই। তিনিসহ তাঁর আশেপাশের অনেক স্বচ্ছল পরিবারই শৈশবে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ায় এমন স্কুলে যেত বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

আহমেদ (২০১৯) এর মতে, মূলত ঔপনিবেশিক আমলে এগিয়ে থাকা হিন্দু মধ্যবিত্ত ও অসম পরিবেশে বিকাশ লাভ করতে থাকা মুসলমান মধ্যবিত্তের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিণামে দেশভাগ হয়। শাসক শ্রেণির কাছ থেকে চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায় আনুকূল্য পেয়ে তাদের যেমন উত্থান ঘটে তেমনি তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত কিছু সংকটও জন্ম নেয়। মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণিস্বার্থে পাকিস্তান সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিল। আর নিম্নবর্গ তাদের উপর ভরসা করে এক ধরনের কল্পনার রাজ্য গড়ে তোলে। কিন্তু যে কারণে

পাকিস্তানের জন্ম হলো, সেই কারণেই নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পাকিস্তান কাঠামোর ভেতর থেকে সংগ্রামের শুরু হয়। কারণ পাকিস্তান আমলে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়লেও রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের ফলে দুই অংশের মধ্যবিত্তের মধ্যে অসম বিকাশ চলে। এর ফলে যে আন্দোলন শুরু হয় তাতে মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব দেয় এবং নিম্নশ্রেণি তাতে অংশ নেয়। এদিকে শোষণ- নিপীড়নের বিরুদ্ধে সৃষ্টি হওয়া রাজনৈতিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন ধীরে ধীরে জাতীয়তাবোধের জন্ম দেয়। মধ্যবিত্তের আচার-আচরণে পরিবর্তন আনে।

পোলার্ড (২০০৮) দাবি করেছেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণি না হলে সমাজে জাগরণ সম্ভব হতো না। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য শহরে বসবাসকারী মধ্যবিত্তের বিকাশ না ঘটলে রেঁনেসা হতো না। আবার আহমদ (২০০৪) এর মতে এ শ্রেণিকে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। কারণ মধ্যবিত্তের রাজনীতি সব সময় পরিবর্তন হতে থাকে। সবাই কম পরিশ্রমে উচ্চবিত্তের কাতারে শামিল হতে চায়। এ ছাড়া তালুকদার (২০১৯) এর মতে, মধ্যবিত্তের মধ্যে রক্ষণশীলতা ও কৌতূহল-দু'টোই দেখা যায়। সামাজিক অবস্থান উন্নত করতে তারা অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করে। কিন্তু তাদের ঝুঁকি নেওয়ার সাহস কম। তাই তারা সাধারণত ক্ষমতাসীনদের প্রতি আনুগত্য দেখায়। তবে আবেগ ও যুক্তির মাধ্যমে এই শ্রেণিকে নাড়া দিতে পারলে শ্রেণিচ্যুতির বিষয়টি তাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

মার্কস ও এঙ্গেলস (উদ্ধৃত উমর, ১৯৮৬: ৩৬) বলেছেন, আশেপাশের বাস্তব পরিবেশ থেকেই মানুষের ধ্যান-ধারণা ও বিবেক তৈরি হয়। এই ধারণা থেকে উমর (১৯৮৬) -এর মত হলো, শিল্পী- সাহিত্যিকদের বিবেক ও ধ্যান-ধারণা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়। আর অর্থনৈতিক অবস্থা মানুষের সামাজিক জীবনের চিন্তা, বিবেক ইত্যাদিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। তবে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার বাইরের সমাজেরও বাস্তবতা রয়েছে। তাই অনেকের ক্ষেত্রে এই বাস্তবতার প্রভাব পড়ে। ফলে নিজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি বাইরের বাস্তব পৃথিবীও তাদের ধ্যান-ধারণা ও বিবেক গঠনে সাহায্য করে।

সাধারণত সমাজে অর্থ বা সম্পদের মানদণ্ডে ও সমাজে তার ভূমিকার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বিবেচনা করা হয় বলে উল্লেখ করেছিলেন রিয়াজ (২০১৮)। তবে শুধু অর্থ বা বিত্ত নয়, মধ্যবিত্তকে চিহ্নিত করা যায় নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে। তিনি মনে করেন, একটি শ্রেণি বিকাশের ধরন বোঝা যায় তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে। বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য তিনি ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক পিয়েরে বোর্দো, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ও সেলিম জাহানের নিবন্ধের কিছু অংশ উল্লেখ করেন। রিয়াজ (২০১৮) বলেন, বোর্দো মধ্যবিত্তের আলোচনায় সাংস্কৃতিক পুঁজির কথা বলেছেন এবং অধ্যাপক নজরুলের নিবন্ধে উল্লেখ আছে ১৯৮০ সালে দেশের একটি অংশের বাইরের দেশে অভিবাসন ও রাজনৈতিক- সামাজিক সুযোগ ব্যবহার করে একটি শ্রেণি উচ্চ পর্যায়ে উঠে আসে। এর ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা পূরণ করে গ্রাম থেকে উঠে আসা মানুষ, যাদের কাছে আয় ও সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এ ধরনের মধ্যবিত্ত শ্রেণির কারণে আগের মূল্যবোধ ও সেক্যুলার সংস্কৃতির গুরুত্ব ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এই বিষয়টির সাথে সেলিম জাহানের ব্যাখ্যার একটি সমন্বয় দেখান রিয়াজ। তিনি দেখান সেলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে- সামাজিক মধ্যবিত্ত ও অর্থনৈতিক মধ্যবিত্ত, এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। সামাজিক মধ্যবিত্ত হলো বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণি, যারা সমাজের বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে কাজ করে এবং অর্থনৈতিক মধ্যবিত্ত হলো যারা উচ্চ শিক্ষিত এবং বিভিন্ন পেশায় জড়িত। এরা সামাজিক মধ্যবিত্তের মতো মূল্যবোধ ও আচরণকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। ফলে রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের আগ্রহ কম বলে মনে করেন রিয়াজ।

হায়াৎ (২০০৭) জানান, জহির রায়হান মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন প্রথমে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ও পরে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। সেলিম (২০১৫) তাঁর একটি প্রবন্ধে বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিয়ে আগ্রহের কারণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে বিভেদ-বিভাজনের ঘটনাগুলোর অধিকাংশ দেশের মেহনতি শ্রেণিসমূহের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশধারা নিয়ে মতভিন্নতা-বিরোধের কারণে ঘটেনি। বরং এর বদলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে মতভিন্নতা-বিতর্ককে কেন্দ্র করে ঘটেছে। তাই চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানকে জানতে হলে তাঁর বামপন্থী আর্দশ ও মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রতিঘাতে তিনি কোন শ্রেণির দিকে বেশি ঝুঁকেছেন সেটি জানার প্রয়োজন। একই সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিকর্মে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতি আগ্রহ দেখা যায় বলে বিভিন্ন সময়ে গবেষকেরা দাবি করেছেন তা অনুসন্ধানের পাশাপাশি তার রূপায়ন তিনি কীভাবে করেছেন তা জানার চেষ্টা এ গবেষণায় করা হবে।

১.২ প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞা

মধ্যবিত্ত শ্রেণি: মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে বোঝায় যারা বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণির মাঝামাঝি অবস্থান করে। এরা শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনা, রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও ভালো আয় করে। মালিকপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে ও অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে। মার্কস (১৮৪৮), রাইট (১৯৭৯) এর মতো তাত্ত্বিকেরা এ শ্রেণিকে রক্ষণশীল, সুবিধাভোগী বলে অ্যাখ্যায়িত করেন। রিয়াজ (২০১৮) বলেন, এ শ্রেণির একটি অংশ বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করেন এবং অন্য অংশ আয় ও সম্পদ বাড়ানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

চলচ্চিত্র: কেম্বব্রিজ ডিকশনারি অনুযায়ী, চলচ্চিত্র হলো কতগুলো চলমান চিত্রের সমন্বয়। কোনো গল্পকে উপস্থাপনের জন্য এ মাধ্যমকে ব্যবহার করা হয়। রাজু (১৯৯০) বলেন, চলচ্চিত্রকারের ভাবনা এবং অর্থপূর্ণ ছবি ও শব্দের সমন্বয়ে চলচ্চিত্র গড়ে ওঠে।

ডিসকোর্স বিশ্লেষণ: ডিসকোর্স হলো নতুন কোনো জ্ঞান বা আলোচনা। ফুকোর (উদ্ধৃত হল, হক অনু., ২০০৭) মতে, ডিসকোর্স আলোচ্যবস্তু নির্মাণ করে। ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান তৈরিকে ডিসকোর্স বলেন ফুকো। আর ডিসকোর্স সংক্রান্ত আলোচনা ও ব্যাখ্যার বিশ্লেষণকে বলা হয় ডিসকোর্স বিশ্লেষণ। ভাষার ব্যবহার ও ছবি উপস্থাপনের মাধ্যমে ডিসকোর্স তৈরি হয়। কোন প্রেক্ষাপটে ভাষার ব্যবহার করা হচ্ছে, কী কারণে হচ্ছে সেটিও এ তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশগ্রহণ খুব বেশি পুরোনো নয়। বলা হয়, চলচ্চিত্রে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ হয়েছে অনেক পরে। মামুন (২০১৬) বলেন, চল্লিশ দশকের আগ পর্যন্ত মুসলমান মধ্যবিত্তকে চলচ্চিত্রে খুব বেশি পাওয়া যায় না। কারণ তখন শিক্ষিত মুসলমানরা এই জায়গাটিকে ভালো চোখে দেখতেন না। পরে কাজী নজরুল ইসলাম, আব্বাসউদ্দিন আহমেদ, নাজীর আহমদ প্রমুখ চলচ্চিত্রের সাথে যুক্ত হন। '৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হলে ধীরে ধীরে চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও স্টুডিও নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হলে এখানে চলচ্চিত্র নির্মাণ এগোতে আরম্ভ করে। তার ধারাবাহিকতায় নাসরীন ও হক (২০০৮) সূত্রে জানা যায়, ৬০-এর দশকে চলচ্চিত্রশিল্প বিকাশ লাভের সময় বাণিজ্যিক ও অফ

বিট[২] ঘরানার চলচ্চিত্র তৈরি হতে থাকে। এমন একটি সময়ে এ জে কারদার, জহির রায়হান, সালাউদ্দিন প্রমুখ পরিচালকের হাত ধরে বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্র নির্মিত হতে থাকে।

জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপায়নের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ- শীর্ষক বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে, জহির রায়হান নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর আলোকে মানুষের জীবন সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কোন শ্রেণি প্রশ্নে দেখা হচ্ছে সেটি আলোচনা করা। কারণ একজন সৃষ্টিশীল মানুষের সৃষ্টিকে সম্যকভাবে জানতে হলে তাঁর শ্রেণি অবস্থান জানা জরুরি। এ বিষয়ে তুহিন (২০১৮) বলছেন, শিল্পের মাধ্যমে একজন মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ ও বিকাশের ধারায় আলাদা সত্ত্বা অর্জন করে। যা জীবন ও জগতে নতুন আলোর সঞ্চার করে। সমাজ বির্নিমাণ ও কল্যাণে ভূমিকা পালন করে। আবার বশীর (২০২০) বলছেন, একজন সৃজনশীল মানুষ তার পরিবেশ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে সত্যকে অনুভব করে তা-ই তাঁর সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে মানুষকে জানানোর চেষ্টা করে। আর শিল্পী মহৎ হয়ে উঠতে পারেন সমাজ সচেতনতা প্রকাশের মাধ্যমে।

জহির রায়হানের মতো একজন বাঙালি মুসলমান চলচ্চিত্রকারের শ্রেণি অবস্থান সমাজ সচেতনতার একটি প্রতিফলন। সমাজ ও ইতিহাসের নানা দিক চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে, তাই তার শ্রেণি অবস্থান বোঝা এই গবেষণার একটি উদ্দেশ্য। এ ছাড়া কবির (২০১৩), তালুকদার (২০১৯), পারভীন (২০১৯) সহ কয়েকজন গবেষক ও আলোচকের মতে, এই পরিচালকের চিন্তার গণ্ডি মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক। যদি তাঁর চলচ্চিত্রের মূল প্রবণতা মধ্যবিত্ত শ্রেণি হয়ে থাকে তবে তাতে এ শ্রেণি উপস্থাপনের স্বরূপ কেমন তা জানতে এই গবেষণাটি পরিচালিত হবে।

১.৪ গবেষণা প্রশ্ন

যেসব প্রশ্ন সামনে রেখে এই গবেষণা পরিচালিত হবে, তা হলো,

১. জহির রায়হান নির্মিত নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলোতে কোনো শ্রেণি ঝোঁক আছে কিনা?

এ প্রশ্নের সহযোগী হিসেবে যে প্রশ্নটি রাখা হচ্ছে সেটি হলো,

২. বিশেষত, নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলোতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি উপস্থাপনের স্বরূপ কেমন?

১.৫ গবেষণা যৌক্তিকতা

শাওন (২০১৮) এর মতে, এদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাস ও জীবন ঘনিষ্ঠ সাহিত্য ধারায় জহির রায়হান একজন বিশিষ্ট শিল্পী। জহির রায়হানের চিন্তা ও কর্মপরিধি নিয়ে যারা কাজ করেছেন তাঁদের আলোচনা পাঠ করলে বা শুনলে বলা যেতে পারে, তিনি একজন শিল্পীর মতো তাঁর চিন্তাকে কলম ও ক্যামেরায় ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি সাহিত্য ও চলচ্চিত্র- দুই ক্ষেত্রে নিজস্ব একটি ভঙ্গিমা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ক্যামেরার ভাষা সে সময়ের জনজীবন, সংস্কৃতি, রাজনীতি- সবকিছু তুলে এনেছে। শিল্পীর কর্ম সম্পর্কে উমর (১৯৮৬) বলেন, সমাজকে বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে শিল্পীরা সচেতনভাবেই বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালান। যে শিল্পীরা

[২]. মারিয়াম- ওয়েবস্টার ডিকশনারি থেকে জানা যায়, অফবিট শব্দটির অর্থ গতানুগতিকের বাইরে বেরিয়ে কোনো ঘটনাকে উপস্থাপন। গীতি আরা নাসরীন ও ফাহমিদুল হক তাঁদের *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প সংকটে জনসংস্কৃতি* গ্রন্থে শৈল্পিক নির্মাণ ও অপ্রথাগত কাহিনি সম্বনিত চলচ্চিত্রকে অফ বিট চলচ্চিত্র হিসেবে আলোচনা করেছেন।

সমাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে সচেতন বা অসচেতনভাবে সমাজ চেতনার কথা বলে গেছেন। তাঁর মতে, নিজস্ব সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণ্ডির বাইরে সমাজ বাস্তবতা শিল্পীর ধ্যান-ধারণা ও বিবেক তৈরি করে এবং সমাজে সব শ্রেণির মানুষের সমাজের প্রতি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কাজে প্রতিফলিত হয়। তাঁরা শ্রম সম্পর্কিত কথা বলেন, শিল্পের সামাজিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে চলেন। তাই জহির রায়হানের সময়কার সমাজ বাস্তবতা ও জহির রায়হানকে সামগ্রিকভাবে জানতে হলে তাঁর শ্রেণি ঝোঁক বোঝা প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ কোনো শিল্পীকে সামগ্রিকতায় বোঝার জন্য শ্রেণি ঝোঁক জানার প্রয়োজনীয়তা এখানেই যে, কোন শ্রেণি-সংস্কৃতিকে শিল্পী ধারণ করেন, বিশেষ করে ৬০- এর দশকে সমাজের এবং একই সাথে কোন শ্রেণির প্রতি তিনি দায়বদ্ধ সেটি বোঝা সম্ভব হয়।

উমরের (১৯৮৬) বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, রায়হান (১৯৬৭) বলেছিলেন, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে একজন সৃষ্টিশীল মানুষ তার সৃষ্টি প্রকাশ যেমন করতে পারেন, তেমনি সমাজের বিকাশের জন্য এটিকে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। অতএব, জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত শ্রেণির চরিত্র বা স্বরূপ বুঝতে পারলে সমাজের বিকাশের পরিস্থিতি বোঝা যাবে। বাংলাদেশে জহির রায়হানের চলচ্চিত্র নিয়ে এ পর্যন্ত দাস (২০১৭), ইসলাম (২০০৯), আরমান (২০১৪), আখতার (২০১৪) প্রমুখ গবেষণা করেছেন। তবে তাঁর চলচ্চিত্রে শ্রেণি ঝোঁক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপায়নের ডিসকোর্স বিষয়ক গবেষণা পাওয়া যায় না। এদিকে আমরা এর আগে রায়হানের (১৯৬৭) লেখা থেকে জেনেছি যে, তিনি শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরদ্ধে কথা বলেছেন। হাননান ও রানু (১৯৯৮) তাঁর সম্পর্কে বলেন, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ কীভাবে সমাজের অবক্ষয় ঘটায় সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন জহির রায়হান। সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আর্দশকে কী উপায়ে বাস্তবায়ন করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর গল্পের মূল বিষয়বস্তুগুলো ছিল নগর ও গ্রামকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত। তাদের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং মুক্তি সংগ্রামে অবদানের কথা উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। এ ছাড়া এ দুই গবেষকের মতে, বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন যখন তুঙ্গে ছিল তখন জহির রায়হান এর সমর্থনে কাজ করেছেন। কিন্তু '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সময় থেকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন জাতীয়তাবাদী।

মনে রাখা প্রয়োজন জহির রায়হান যে সময়ে কাজ শুরু করেছিলেন সে সময় বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক মতাদর্শগত মেরুকরণ চলছিল। বিশ্বে সমাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তা বাড়ছিল। তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল পূর্ব পাকিস্তানেও। এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে কীভাবে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের একটি অংশ গ্রহণ করলো তা বুঝতে হলে বাঙালি মুসলমানদের উত্থান ও বিকাশ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সেন (১৯৮৫) জানান, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা ও ১৮৩৫ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি কাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের মতো ঘটনা বাংলার সামাজিক স্তরবিন্যাসে একটি পরিবর্তন এনেছিল। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমান শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যাকে হাননান ও রানু (১৯৯৮) একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বলেছেন। তাঁদের মতে, এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চার বছর পর মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও তার কয়েক বছর পর প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কলকাতা ও ঢাকা- এই দুই জায়গাকে কেন্দ্র করে মূলত এর বিকাশ শুরু হয়।

একই কথা তার প্রবন্ধে বলছেন আলী (২০২০)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ববঙ্গে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাঁর মতে, ব্রিটিশ আমলে কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতিশীল নেতৃত্বে যে তেভাগা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার একটি প্রভাব কৃষকদের ওপর পড়েছিল। এর ফলে গ্রামীণ কৃষক সমাজের মধ্য থেকে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়, যারা ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর ভাষা বিষয়ে বৈষম্যের শিকার হয়। আর এখান থেকেই সেটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়।

তবে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশ এত সহজ ছিল না। ছফা (১৯৮১) বলেন, উনিশ শতকে হিন্দু সমাজের একাংশকে যে ইউরোপীয় ভাবধারা উদ্বুদ্ধ করেছিল, মুসলমানেরা তা গ্রহণ করতে চাননি। হিন্দুরা ধর্মীয় সংস্কার, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্ত আনার চেষ্টা করছিলেন। সে সময় মুসলমানরা নিশ্চুপ ছিলেন। ফলে হিন্দুদের তুলনায় তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মতে, বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে যে চেতনা পরে বাঙালির মধ্যে জেগে ওঠে তা আদতে হিন্দু মধ্যবিত্তদের আন্দোলনের ধারাবাহিক একটি অংশমাত্র। ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান তথা বাঙালি মুসলমানরা কখনো ধর্মীয় চিন্তা ও প্রচলিত সংস্কারকে আঘাত করে কোনো রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন করতে পারেনি বলে দাবি করেন তিনি।

এদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম মধ্যবিত্তের শিল্প, সাহিত্য ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিকাশের ধারায় বামপন্থী মতাদর্শ বিস্তার লাভ সম্পর্কে আহমদ (উদ্ধৃত আলীম, ২০১৯: ৩৫) জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরের বছর কবি কাজী নজরুল ইসলাম, আব্দুল হালীম, হেমন্তকুমার প্রমুখ ব্যক্তিদের মাধ্যমে কলকাতায় বামপন্থী আন্দোলন শুরু হয়। ধীরে ধীরে তা অবিভক্ত বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। নানা ঘটনা প্রবাহের এক পর্যায়ে ৪৭- এর দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় নতুন করে বামপন্থী সংগঠন গড়ে তোলা হয়। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার, শচীন বোস, মির্জা আবদুস সামাদ প্রমুখ এর সদস্য ছিলেন। হায়াৎ (২০০৭) জানান, অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের কারণে জহির রায়হানও এক সময় কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমে অংশগ্রহণ শুরু করেন। পরে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। হাননান ও রানু (১৯৯৮)- এর মতে, ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবি তোলার মাধ্যমে মুসলমান মধ্যবিত্ত জেগে উঠতে শুরু করলেও ১৯৪৭ সালে ভারত- পাকিস্তান ভাগ হওয়ার পর ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। সেই জাতীয়তাবাদী মনোভাব জহির রায়হানের সৃষ্টিকর্মে প্রতিফলিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও তাঁর মধ্যে সেই জাতীয়তাবাদী চেতনা খুঁজে পাওয়া যায়। লোককাহিনি নির্ভর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতি তুলে ধরার উদ্যোগ চোখে পড়ে। যদিও এই চলচ্চিত্রকারকে একসময় অর্থাভাবে বাণিজ্যিক ছবিও নির্মাণ করতে হয়েছে। সেই আর্থিক কষ্টকে নিবারণ করার পরই তিনি রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাণে সক্ষম হয়েছিলেন।

একদিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জনপ্রিয়তা এবং পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যকার অস্থিরতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানের মধ্যে একজন চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের সৃষ্টির রূপরেখা বোঝার জন্য এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ যিনি সময়ের প্রয়োজনে একজন রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি সিনে ইন্ডাস্ট্রির স্রোতের বিপরীতে গিয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে সফল হয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন কাহিনি নিয়ে তিনি তাঁর একেকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। তাঁর চিন্তা ও কর্মের নান্দনিকতায় ইতিহাসের পাতায় তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের একজন প্রভাবশালী চলচ্চিত্রকার। এই প্রভাবশালী চলচ্চিত্রকার হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর শ্রেণি অবস্থান এবং রাজনৈতিক চেতনার স্বরূপ অনুসন্ধান জরুরি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা ও তাত্ত্বিক কাঠামো

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

জহির রায়হানের চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে গবেষকেরা সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন *কখনো আসেনি* (১৯৬১) ও *জীবন থেকে নেওয়া* (১৯৭০) চলচ্চিত্র নিয়ে। এ ছাড়া *কাঁচের দেয়াল* (১৯৬৩) ও *আনোয়ারা* (১৯৬৭)- এ দুইটি চলচ্চিত্র নিয়েও কাজ দেখা গেছে। এসব গবেষণায় সমাজ সচেতনতা, রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকার হিসেবে তাঁর চলচ্চিত্রে জাতীয়তাবাদের উপস্থাপন, তাঁর চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত কাহিনির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণি ঝোঁক কেন্দ্রিক বা বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির রূপায়ন সম্পর্কিত গবেষণা পাওয়া যায়নি।

চৌধুরী ও আকতার (২০১৭) জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত সমাজ নিয়ে গবেষণা করেছেন । তাঁদের গবেষণায় উল্লেখ করা হয়, *কখনো আসেনি* চলচ্চিত্রে পরিচালক মার্কসবাদী ভাবাদর্শ অনুসরণ করে সে সময়কার আর্থসামাজিক সংকট ও মানুষের জীবন সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন। আর *কাঁচের দেয়াল* চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যাপিত জীবন, রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁর বাণিজ্যিক ঘরানার ছবি *বেহুলা*-কে বিশ্লেষণ করে তাঁরা বলেছেন 'শ্রেণিদ্বন্দ্বের বিল্লবী চিত্রগাঁথা'।

একই চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনায় পারভীন (২০১৯) বলেন, *কখনো আসেনি* চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্তের হতাশা ও সংকটের গল্পের সঙ্গে ভোগবাদী সমাজের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া পরিচালক এখানে সমাজের বাস্তবতা, শ্রেণি-বৈষম্যের বিষয়টি চিত্রায়িত করেছেন।

জহির রায়হানের চলচ্চিত্র নিয়ে ইসলাম (২০০৯) কাজ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধে (২০০৯) তিনি উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক ভাবনা জহির রায়হানের সব চলচ্চিত্রে হয়তো উঠে আসেনি, তবে সমাজ বাস্তবতার দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। *কখনো আসেনি* চলচ্চিত্রে শ্রেণিগত দ্বান্দ্বিক অবস্থানের বিষয়টি এসেছে। আর *কাঁচের দেয়াল* চলচ্চিত্রটি বাঙালি মধ্যবিত্তের মূল্যবোধকে কিছুটা নাড়া দিতে পেরেছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

কখনো আসেনি একটি মনস্তাত্ত্বিক ছবি দাবি করে হায়দার (২০১৩) বলছেন, এখানে দারিদ্র্যের বিষয়টি খোলামেলাভাবে দেখানো হয়েছে। কাহিনিতে প্রেম, পারিবারিক বন্ধন, স্নেহ, খুনসুটি আছে। জহির রায়হান এ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক বুঝিয়েছেন। এ সম্পর্ক সব সময় তিক্ত ও ধারালো বলে তিনি মনে করেছেন।

হোসেন (২০১৮) শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান দেখতে পান জহির রায়হানের *কখনো আসেনি* চলচ্চিত্রে। তিনি উল্লেখ করেন, ৬০-এর দশকের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মূল্যবোধগুলো এখানে যথেষ্ট স্পষ্টভাবেই উঠে এসেছে। এ ছাড়া মধ্যবিত্তের সংবেদশীলতার বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে চলচ্চিত্রের প্রধান চরিত্র শওকতের শিল্পী জীবন ও বেশভূষার ব্যাপারটি চোখে পড়ে।

আবার আলম (২০১৯)- এর মতে, *কখনো আসেনি* চলচ্চিত্রটির একটি শক্তিশালী আর্থ-রাজনৈতিক বার্তা আছে যেখানে বলা হচ্ছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধনিক শ্রেণি জনগণকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এর পরিণতিতে

এ শ্রেণির সাথে জনগণের এক ধরনের দ্বন্দ্ব কাজ করে। এ ছাড়া অত্যাচারী ও নিপীড়িতের মধ্যে যে আর্থ-সামাজিক উত্তেজনা ছিল সেটিও এখানে উঠে এসেছে। তিনি মনে করছেন, জহির রায়হান এ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির চেষ্টার কথাও বলেছেন। এ বিষয়ে একই কথা বলেছেন ফিরদাউস (২০১৭)। তাঁর মতে, সে সময়কার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ধনিক শ্রেণি ও অত্যাচারিতের মধ্যকার সংঘাতের আলোচনা এখানে আছে। তিনি মনে করেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের শিল্পীসত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়।

জহির রায়হান মার্কসবাদী ধারায় বিশ্বাসী হলেও *কখনো আসেনি* চলচ্চিত্রে সে ধরনের কোনো রাজনৈতিক বার্তা পাওয়া যায় না বলে মনে করেন চৌধুরী (২০১৬)। তবে সমাজের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য এবং বিশেষ করে নারীর অধস্তনতা ও সংগ্রামের কাহিনি বলা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, পঞ্চাশ দশকের আর্থ- সামাজিক পটভূমিতে মানুষের সংগ্রামের গল্প এতে পাওয়া যায়।

আনোয়ারা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জহির রায়হান সামাজিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন বলে মন্তব্য করেন রহমান (২০১৭)। তিনি বলেন, বিভিন্ন ধর্মীয় মূল্যবোধকে ঘিরে চরিত্রগুলোর গল্প এগিয়ে গেছে। গ্রামীণ মুসলমান পরিবারের সংস্কৃতির নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই ধর্মীয় দর্শন ভালোমতো চোখে পড়ে।

জহির রায়হানের প্রথম রাজনৈতিক চলচ্চিত্র *জীবন থেকে নেয়া*- এর ওপর গবেষণা করেছেন আখতার (২০১৪)। তাঁর মতে, এই চলচ্চিত্র প্রমাণ করে, কোনো চলচ্চিত্র একাধারে কেতাদুরস্ত, জাতীয় ও পারিবারিকভাবে রাজনৈতিক ও বাস্তবসম্মত হতে পারে। জহির রায়হান এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ- পূর্ব বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি তুলে ধরেছেন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে।

আরমান (২০১৪) তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, *জীবন থেকে নেয়া* চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাঙালির রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলা ও বাঙালির সংস্কৃতিকে তুলে ধরার পাশাপাশি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের ইঙ্গিত দিয়েছেন জহির রায়হান।

জাতীয়তাবাদী চলচ্চিত্র হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করে একই চলচ্চিত্র সম্পর্কে ইসলাম (২০১৯) উল্লেখ করেছেন, এখানে অন্দরমহল ও বাইরের শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে বিপ্লবী কার্যক্রম দেখানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি মৃণাল সেন- এর *কলকাতা ৭১* (১৯৭১) চলচ্চিত্রটির উদাহরণ টেনে বলেন, উপনিবেশিক পর্যায়ের শুরুতে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে কথা বলার মানুষ সেভাবে ছিল না। জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটলে তখন ঔপনিবেশিক শক্তি ও জাতীয়তাবাদের লড়াইয়ে জাতীয়তাবাদকে জয়ী হতে দেখা যায়।

কাঁচের দেয়াল-এর কাহিনিতে মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বপ্নভঙ্গ, অপরিনামদর্শী ব্যক্তিগত বিদ্রোহের অবসাদগ্রস্ততা রয়েছে বলে তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন মাহমুদ (২০১৭)। আবার ১৯৬১-তে *কখনো আসেনি* চলচ্চিত্রে সাংস্কৃতিক উত্থানকে বন্ধ করতে স্বৈরশাসকের চেষ্টাকে প্রতীকী রূপায়নে দেখানো হয়েছে। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে ঘিরে সে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে।

এসব গবেষণার ছাড়াও জহির রায়হানের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে ভিন্নধর্মী গবেষণা করেছেন দাস (২০১৭)। তাঁর গবেষণার একটি অংশে তিনি আলোচনা করেছেন, জহির রায়হানের চলচ্চিত্র *জীবন থেকে নেয়া*-তে জহির দেখাতে চেয়েছেন রাষ্ট্রের দমন–পীড়নে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের গল্প। যেখানে

সাধারণ মানুষের প্রতীকীতে মধ্যবিত্তকে তুলে ধরা হয়। আর লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র *বেহুলায়* স্বর্গবাসী ও মর্ত্যবাসীর দ্বন্দ্বে জয় হয় স্বর্গবাসীর। তাঁর মতে, চলচ্চিত্রের এমন উপস্থাপনে বোঝা যায়, ক্ষমতাবানদের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ে প্রাণ- সম্পদের নাশ করে কোনো লাভ নেই। এ ধরনের দ্বন্দ্বে কোনো পরিবর্তন আসবে না। এর চেয়ে ক্ষমতাবানদের পক্ষে থেকে, তাদের কর্মকাণ্ড মেনে নিয়ে চলতে পারলে টিকে থাকা যাবে। আবার নজিবর রহমানের উপন্যাস *আনোয়ারা* অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রে বাঙালিরা ভালো- মন্দসহ হাজির হলেও, ব্রিটিশ কোম্পানির কোনো খারাপ দিক চোখে পড়ে না। ফলে ক্ষমতাবানরা ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে বৈধতা পান বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ ছাড়া জহির রায়হান গ্রামের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও শহরের নব্য- পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের মধ্যকার পার্থক্য ধরতে পেরেছিলেন। তিনি গ্রামের অবকাঠামো নিয়ে যতটা কথা বলেছেন, তারচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন শহরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের নিয়ে। দাসের অনুসন্ধানে এমনটিই পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ক্ষমতার সঙ্গে ক্ষমতার লড়াইয়ে যখন নিম্নবর্গ হেরে যায় তখন সমাজ–সংস্কৃতিতে ক্ষমতাবানদের কথাই চলে আসে।

২.২ তাত্ত্বিক কাঠামো

গবেষণায় শ্রেণি ঝোঁক ও মধ্যবিত্তের রূপায়ন বুঝতে জার্মান তাত্ত্বিক ও দার্শনিক কার্ল মার্কসের শ্রেণি তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বকে বিশ্লেষণকারী আরেক জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবারের সামাজিক স্তরবিন্যাস নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে বর্ণনতত্ত্ব, রেপ্রিজেন্টেশন, সেমিওলোজি, ডিসকোর্স- মধ্যবিত্ত শ্রেণির রূপায়ন বুঝতে সাহায্য করবে।

২.২.১ শ্রেণি তত্ত্ব

মার্কস ও এঙ্গেলস (১৮৪৮) বলেছেন, মানব জাতির ইতিহাস হলো শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। অত্যাচার ও অত্যাচারিত-এই দুই শ্রেণি সব সময় নিজেদের সাথে লড়াই করেছে। এর সমাপ্তি ঘটেছে হয় নতুন সমাজ গঠনে বা শ্রেণিগুলো ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে। বটোমোর (উদ্ধৃত ঘোষ অনু., ১৯৯৩: ৩২) বলেন, মার্কসবাদীদের মতে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সমাজে নানা শ্রেণি গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত মালিকানাকে কেন্দ্র করেই শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে। মার্কসের এই শ্রেণি ধারণা সম্পর্কে আবার লেনিন (উদ্ধৃত ঘোষ অনু., ১৯৯৩: ৩২) বলেন, বড় গোষ্ঠীকে শ্রেণি বলা হয়। তারা একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে যায় সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের স্থান, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক, শ্রমের সামাজিক সংগঠনে নিজের ভূমিকা এবং সমাজে সম্পদের যে অংশ তারা ভোগ করে তা লাভ করার পদ্ধতি ও আয়তন অনুযায়ী। অর্থাৎ, শ্রেণি হলো এমন এক গোষ্ঠী যারা নির্দিষ্ট কোনো সমাজ ও অর্থনীতির প্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য শ্রম শোষণ করার চেষ্টা করে। এ জন্য পুঁজিপতি শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে প্রতিনিয়ত শ্রেণিদ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকে। কারণ তাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী।

এদিকে মার্কস (উদ্ধৃত বটোমোর, ১৯৭৫: ৩৪-৩৫) বলেন, উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্ষমতা কাঠামোর উচ্চ স্তরে থাকা শাসক শ্রেণি সব সময় শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ করে। ফলে শ্রমিক শ্রেণি স্বার্থ কখনো উদ্ধার হয় না। তাই সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার আদায় করে নিতে হয় তাদের। এভাবে দাস সমাজ থেকে সামন্ত সমাজ, সামন্ত সমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। শ্রেণি সংগ্রামের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো রাজনৈতিক সংগ্রাম। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

মার্কসের মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞা পাওয়া কঠিন। তিনি মালিক ও নিয়ন্ত্রকদের বুর্জোয়া বলেছেন। আবার যারা মালিকও না ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রকও না তাদের প্রোলেতারিয়েত বলছেন। এরা শুধু শ্রম বাজারে তাদের শ্রম বিক্রি করবে। মার্কস ও এঙ্গেলস (১৮৪৮) বলেন, বুর্জোয়াদের পুঁজি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রোলেতারিয়েতদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। তারা যত শ্রম দেয় পুঁজি তত বাড়তে থাকে। এ বাবদ শিল্পের মালিকদের কাছ থেকে তারা মজুরি পায়। আর এ মজুরির বাকি টাকা শোষণ করে বাড়ির মালিক, ব্যবসায়ী ও দোকানদারেরা। যাদের মার্কস বুর্জোয়া শ্রেণির অন্য একটি অংশ হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করেছেন। আবার পুঁজিবাদী ও প্রোলেতারিয়েতদের মাঝামাঝি অবস্থাকারীদের নিম্নমধ্যবিত্ত বলেছেন। ছোট ব্যবসায়ী, দোকানি, চাষি, হস্তশিল্পী, যারা আগে ব্যবসা করতেন তাদেরকে এ শ্রেণির মানুষ বলে দাবি করেছেন তারা। এদের বলা হচ্ছে পেটি বুর্জোয়া। এর কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন আধুনিক শিল্প বড় আকারে চালাতে গেলে যে পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন সে পরিমাণ পুঁজি তার থাকে না। বরং বড় পুঁজি যাদের আছে তারা এ শিল্পগুলো নিজেদের দখলে নেয়। তাঁর মতে, সব ধরনের শ্রেণি থেকে আসা মানুষের মাধ্যমে 'পুষ্টিলাভ' করে প্রোলেতারিয়েত বেঁচে থাকে।

মার্কস সামাজিক স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থায় মালিকানা, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা ও পেশাগত ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন বলে জানান সেন (১৯৮৫)। তিনি আরও বলেন, সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য মার্কস অর্থনৈতিক উপাদানগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক উপাদানের বিষয়েও সচেতন ছিলেন।

এদিকে মার্কসের ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ম্যাক্স ওয়েবার মার্কসের উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে-এ দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করলেও তিনি মনে করতেন শ্রেণি ধারণাটি অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যের কারণেও উদ্ভূত হয়েছে। এ বিষয়ে ওয়েবারের বই (১৯৭৮) এর একটি অধ্যায় *দি ডিসট্রিবিউশন অব পাওয়ার উইদিন দি কমিউনিটি: ক্লাস, স্ট্যানদে, পার্টিস*[৩]- এ বিষয়ে বিস্তারিত পাওয়া যায়। ২০১০ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ড্যাগমার ওয়াটারস ও টনি ওয়াটারসসহ কয়েকজন। এই অধ্যায়ে ওয়েবার সামাজিক স্তরবিন্যাস তত্ত্ব সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা হলো, শ্রেণি বিভাজন শুধু উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ন্ত্রণের অভাব থেকে সৃষ্টি হয় না। বরং এটি অর্থনেতিক পার্থক্য থেকেও আসে যার সাথে সম্পত্তির কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি মনে করতেন সম্পদের পার্থক্য শ্রেণি তৈরি করে। মর্যাদার পার্থক্য তৈরি করে মর্যাদা গোষ্ঠী এবং ক্ষমতার পার্থক্যের কারণে রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হয়।

শ্রেণিগুলো অর্থনেতিক ব্যবস্থা এবং মর্যাদাভিত্তিক গোষ্ঠীগুলো সামাজিক অবস্থানের অন্তর্ভুক্ত। ওয়েবারের মতে, বড় অঙ্কের অর্থ থাকলেই শুধু মর্যাদা গোষ্ঠীর মধ্যে থাকা যায় না। পেশা, জীবনযাত্রার ধরনও মর্যাদা নির্ধারণ করে। এদিকে সামাজিক স্তরবিন্যাস তত্ত্বের যে তৃতীয় স্তর হলো ক্ষমতা, সেখানে দেখা যায় রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি। এই দলগুলোর তখনই উদ্ভব হয় যখন তারা কোনো গোষ্ঠীর কাজ ও মতাদর্শকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে ক্ষমতাও গ্রহণ করতে চায়। অর্থাৎ, পার্টি বা দল সামাজিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য কাজ করে।

এ ছাড়া ওয়েবার (উদ্ধৃত ওয়াটারস ও ওয়াটারস, ২০১০: ১৩৯) বলেছেন, সমাজের কিছু ব্যক্তির অধিকারে কিছু দ্রব্য থাকে যা তারা অন্যের কাছে বিক্রি করে। কিছু ব্যক্তি শ্রমবাজারে তাদের শ্রম বিক্রি করে। আর কেউ

[৩] ম্যাক্স ওয়েবারের *Economy and Society* গ্রন্থের একটি অধ্যায় 'The Distribution of Power Within the Community: Classes, Stände, Parties'-নামটি অনুবাদ করা হয়েছে।

কেউ অর্থের বিনিময়ে মক্কেলকে সেবা দেয়। এভাবে বিক্রয়ের মাধ্যমে পাওয়া অর্থ তাদেরকে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ভোগের সুযোগ করে দেয়। বিক্রেতারা তাদের এই ভোগের বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ কে কতটুকু ভোগ করতে পারছে সে হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে অবস্থান করেন। এভাবে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির মাঝামাঝি মেধা বিক্রি করে বেঁচে থাকা গোষ্ঠী মধ্যবিত্ত হিসেবে পরিচিতি পায়। মূলত সম্পত্তি ও সম্পদ এবং সমত্তি ও সম্পদের অভাব-এই দুইটি শ্রেণি সব শ্রেণি অবস্থাকে তুলে ধরে।

গিডেনস (২০০৭) এর মতে, অতীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার ও কৃষক। পরে ধীরে ধীরে তারা উচ্চমধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তে ভাগ হয়ে পড়ে। লেখাপড়া জানা, রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও ভালো বেতনে চাকরি করা শ্রেণিটি উচ্চমধ্যবিত্তের কাতারে এসে পড়ে। আর কর্মচারী, সেবিকা, বিক্রয় প্রতিনিধি প্রভৃতি পেশার মানুষ নিম্নমধ্যবিত্তের পরিচিতি পায়। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি সব সময় নিজেদের পরস্পর বিরোধী একটি চাপের মধ্যে আবিষ্কার করে।

এদিকে মার্কস ও ওয়েবারের তত্ত্বকে সমন্বয় করে নতুন একটি তত্ত্ব দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজবিজ্ঞানী এরিক ওলিন রাইট। রাইট (১৯৭৯) তাঁর বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে[৪] শ্রেণি সম্পর্কে শ্রেণি কাঠামোর মধ্যে পরস্পরবিরোধী অবস্থানের বিষয়ে আলোচনায় করেন। এই অবস্থানের ক্ষেত্রে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন কারখানার ফোরম্যান বা তত্ত্বাবধায়কের কথা। এরা শ্রমিকদের অল্পসল্প নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই শ্রমিক শ্রেণিকে যেভাবে শনাক্ত করা সম্ভব, এরা তার কাছাকাছি অবস্থান করে, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের পুরোপুরি শ্রমিক শ্রেণিতে ফেলা যায় না। আবার কারখানার ব্যবস্থাপক বুর্জোয়া শ্রেণি নির্ধারণের সীমানার কাছে অবস্থান করেন। সে হিসেবে 'মধ্যবিত্ত'কে তিনি সামাজিক শ্রেণির এমন একটি অংশ হিসেবে দেখান যারা কাঠামোতে এ ধরনের অবস্থানে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির মধ্যে পুঁজিবাদী ও শ্রমজীবী দুইটি উপাদানই আছে। এই শ্রেণি উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের ওপর ক্ষমতা চর্চা করতে পারে, কিন্তু মূল পুঁজির বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে না।

রাইট আরও বলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপরমহলের সাথে সম্পর্ক এবং কাজে দক্ষতা থাকে। রাইটের মতে, এই দুইটি উপাদান এই শ্রেণিকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করে তোলে। কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক থাকায় মধ্যবিত্ত কিছু সুবিধা ভোগ করে। শ্রমজীবীদের মূল্যায়ন করার ক্ষমতা তাঁর হাতে থাকে। কাজ করলে পুঁজিবাদী কর্তৃপক্ষ বেতন বাড়িয়ে বা পদোন্নতি দিয়ে পুরস্কৃত করে। সেই সাথে কাজের প্রতি দক্ষতা তাকে কিছু ক্ষমতা চর্চারও সুযোগ করে দেয়।

এই গবেষণায় যেহেতু জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে শ্রেণি ঝোঁক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে, সে জন্য শ্রেণিতত্ত্ব ও সামাজিক স্তরবিন্যাস তত্ত্বের প্রয়োজন আছে। এই দুই তত্ত্বের মাধ্যমে তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলোতে শ্রেণি ঝোঁক ও মধ্যবিত্তের ধরন বিশ্লেষণ করা হবে।

[৪] এরিক ওলিন রাইট এর গ্রন্থ *Class Sturcture and Economic Determination* (1978) এর প্রথম অধ্যায় Theoritical Perpective এর দ্বিতীয় অংশ Classes in Advance Capitalist Society থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

২.২. ২ বর্ণনতত্ত্ব (ন্যারেটোলজি)

ন্যারেটিভ বা বর্ণনা বা অ্যাখ্যান বলতে সাধারণত কোনো ঘটনাক্রমের উপস্থাপন বোঝায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব আলোচনাই বর্ণনা বা আখ্যান। এই বিষয়ে বার্থ (১৯৭৫) বলছেন, ভাষা হলো আখ্যানগুলো বাহন। তা হতে পারে লিখিত বা মৌখিক, ছবি বা চলচ্চিত্র, অঙ্গভঙ্গি অথবা সবগুলো উপাদান মিলিয়ে। রূপকথা, পুরানকথা, ছোটগল্প, ইতিহাস, হাস্যরস, নাটক, পুতুলনাচ, সংবাদ, বিয়োগান্তক ঘটনা, চিত্রকর্ম, চলচ্চিত্র, সংলাপ-সব কিছুতে বর্ণনা উপস্থিত থাকে বলে জানান তিনি।

এ কথাগুলোকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে বার্থ বলছেন,

> বর্ণনা রয়েছে সব কালে, সব স্থানে, সব সমাজে; বস্তুত মানব ইতিহাসের সাথে আখ্যানের শুরু হয়; এমন অ্যাখ্যান ছাড়া কোনো মানুষ কখনো ছিল না, কখনো কোথাও থাকবেও না; সব শ্রেণি, সব মানবগোষ্ঠীর নিজস্ব গল্প থাকে এবং প্রায় সময়ই এ গল্পগুলো ভিন্ন বা বিপরীত সংস্কৃতির মানুষেরা উপভোগ করেছে (বার্থ, ১৯৭৫: ২৩৭, অনুবাদ গবেষকের)।

ন্যারেটোলজি হলো আখ্যান, আখ্যান কাঠামো ও এটি মানুষের অনুধাবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তার অধ্যয়ন পদ্ধতি। সাহিত্য বিশ্লেষণের জন্য এ পদ্ধতি পরিচিত করে তোলেন বুলগেরিয়ান- ফ্রেঞ্চ সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক ও কাঠামোবাদী সাহিত্য সমালোচক জেভান তোদোরফ। তোদোরফ (১৯৭১) ন্যারেটিভের ক্ষেত্রে মূলত পাঁচটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এখানে প্রথমে থাকে ভারসাম্য অবস্থা, যেখানে সব কিছুর মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য থাকবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কোনো ঘটনা ঘটার কারণে এই ভারসাম্য অবস্থা ব্যাহত হবে। এর পরের পর্যায়ে চরিত্ররা সমস্যা সম্পর্কে ধারণা পাবে; এবার তারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে এবং শেষ পর্যায়ে সমাধান ঘটার মাধ্যমে পূর্বের সাম্যাবস্থা আবার ফিরে আসবে।

এই পদ্ধতি পরে আধুনিকরূপ পায় রাশিয়ান ফর্মালিস্ট ভ্লাদিমির প্রপের মাধ্যমে। প্রপ (১৯২৮) তাঁর গবেষণায় ১০০টি রাশিয়ান রূপকথা বিশ্লেষণ করেন এবং দেখান সব রূপকথার কাঠামো একই রকম। নায়ক, নায়িকা, খলনায়ক, সাহায্যকারী, মেকি নায়কসহ সাত ধরনের চরিত্র তিনি বিশ্লেষণ করে খুঁজে পান; যাদের কর্মকাণ্ড প্রতিবার ঘুরেফিরে একই ধরনের বলে লক্ষ্য করেন।

এ পর্যন্ত তাত্ত্বিকরা ন্যারেটোলজি সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রিন্স (১৯৯৫) বলছেন, এটি মূলত অ্যাখ্যান পাঠের অন্তরালে থাকা কাঠামোটি তুলে ধরতে সাহায্য করে। এ ছাড়া প্রিন্স (১৯৮২) আরও বলেছেন, সব অ্যাখ্যানের মধ্যে কী মিল আছে এবং অ্যাখ্যানগুলো কীভাবে একে অন্যের চেয়ে আলাদা হয়ে ওঠে সেটিও ন্যারেটোলজি অনুসন্ধান করে।

ন্যারেটোলজি সম্পর্কে গায়েনের (২০১৩) মতে, কোনো বর্ণনা বা আখ্যান আশপাশের জগত সম্পর্কে আমাদের ভেতর যে অনুধাবন তৈরি করে দেয় তার পাঠ পদ্ধতি হলো ন্যারেটোলজি। তিনি ন্যারেটোলজি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

> .. পদ্ধতি হিসেবে ন্যারেটোলজিতে বিভিন্ন চরিত্রের আচরণ বিশ্লেষণ করা হয় দৃশ্যপরম্পরায় তাদের সামাজিক. রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ককে উন্মোচনের তাগিদ থেকে। এ জাতীয় বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্য হলো গবেষণা উপাদানের শ্রেণিকরণ থেকে সরে দাঁড়িয়ে এসব উপাদান কীভাবে প্রকৃত অ্যাখ্যানকে বুঝতে সাহায্য করে, তার পাঠ (গায়েন, ২০১৩: ৫১)।

ওনেগা ও লান্ডা (২০১৪)- এর মতে, ১৯৭০-এর দশকে ন্যারেটোলজি বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠে জেরার্ড জেনেট, জেরাল্ড প্রিন্স, মাইক বালসহ আরও অনেকের মাধ্যমে। শুরুতে কাঠামোবাদী ধারার মধ্যে এটি আটকে থাকলেও পরে এটি জেন্ডার স্টাডিজ, মনোবিশ্লেষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। তবে ন্যারেটোলজি কোনো একক তত্ত্ব নয়। বিভিন্ন তত্ত্ব ও ধারণার সমন্বয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে জার্মান অধ্যাপক টিটজম্যান (উদ্ধৃত গায়েন, ২০১৩: ৫১) বলেছেন, কোনো নির্দিষ্ট ধারার তত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব ন্যারেটোলজি করে না, বরং ধারার ভিন্নতায় এটি আখ্যান বা বর্ণনার বিভিন্ন অর্থ প্রদান করে।

চলচ্চিত্রেও এই পদ্ধতি দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করতে জেরার্ড জেনেটের ন্যারেটিভ ডিসকোর্স পদ্ধতিটি বর্তমানে ফিল্ম ন্যারেটোলজি হিসেবে পরিচিত। জেনেটের (১৯৭২) মতে, ন্যারেটিভ ডিসকোর্স হচ্ছে আখ্যান ও কাহিনির মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ পাঠ। এটি কোনো ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে এক ধরনের মৌখিক বা লিখিত ডিসকোর্স। এ ক্ষেত্রে তিনি তিনটি উপাদান প্রস্তাব করেন, তা হলো- দ্যোতিত বা অ্যাখান বিষয়বস্তুর জন্য কাহিনি (Story); দ্যোতক বা বক্তব্য ও ডিসকোর্সের বর্ণনা কৌশল (Narrative); কাহিনি উৎপাদনের জন্য ঘটনার বর্ণনা করা (Narrating)। পাশাপাশি তিনটি ভাগে তিনি ন্যারেটিভ বা অ্যাখানের সমস্যাগুলোকে শ্রেণিভুক্ত করেছেন; একটি হলো কাল (Tense)- যেখানে গল্পের সময় ও ডিসকোর্স সময়ের মধ্যকার সম্পর্ক পাওয়া যায়; দ্বিতীয় হলো দৃষ্টিকোণ (Aspect), এখানে একজন বর্ণণাকারী কীভাবে কাহিনিকে অনুধাবন করেন সেটি বোঝা যায়; তৃতীয় হলো মেজাজ (Mood), যেখানে বর্ণনাকারী কোন ধরনের ডিসকোর্স ব্যবহার করেন তা উপস্থাপিত হয়।

ন্যারেটোলজি নিয়ে গায়েন (২০১৩) তাঁর গবেষণায় বলেছেন, ন্যারেটিভ সাধারণত চলচ্চিত্রে মানুষের চরিত্র ও সংগ্রামকে তুলে ধরে। তাঁর মতে, সব কাহিনিতে চরিত্রগুলোর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে এবং তারা বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি লক্ষ্য পূরণ বা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। ন্যারেটোলজি বা বর্ণনতত্ত্বের মাধ্যমে জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্তকে কীভাবে দেখানো হয়েছে এবং তারা এখানে কী ভূমিকা রাখছে সেটি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া মধ্যবিত্তের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে হলে এ তত্ত্বের আলোকে এই শ্রেণির কাঠামো কীভাবে গড়ে উঠেছে তা বোঝা জরুরি।

২.২.৩ রেপ্রিজেন্টেশন

জ্যামাইকান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ মার্কসিস্ট সমাজতাত্ত্বিক ও সংস্কৃতি তাত্ত্বিক হল (১৯৯৭) বলছেন, রেপ্রিজেন্টেশন বলতে সাধারণভাবে ভাষার মাধ্যমে আশপাশে থাকা বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনা সম্পর্কিত ধারণার অর্থপূর্ণ উপস্থাপন। ধারণা ও ভাষার মধ্যকার সংযোগ পৃথিবীকে মানুষের সামনে তুলে ধরে। একই সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে ভাষার মাধ্যমে অর্থ তৈরি ও বিনিময় হয়।

বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে মানুষের মস্তিষ্কে থাকা ধারণা এই অর্থ উৎপাদনে সাহায্য করে। এখানে সামনে উপস্থিত ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে ধারণার পাশাপাশি অদেখা অনেক বিষয়েও মানুষ অর্থ উৎপাদন করে। যেমন, ঈশ্বর, ভালোবাসা, কষ্ট, মৃত্যু ইত্যাদি। বিন্যাস ও শ্রেণিকরণের মাধ্যমে এই ধারণাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয় এবং এসব ধারণাগুলোকে মানুষ কার্যকরণ করে, যা মানসিক রিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে পরিচিত। তবে আশপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনা বা কোনো বিষয় সম্পর্কে একেকজনের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। একই সংস্কৃতিতে থাকা মানুষের মধ্যে মানসিক ধারণার মিল থাকায় তারা যোগাযোগ করতে সক্ষম।

ধারণাগুলোকে লিখিত শব্দ, ধ্বনি ও চিত্রের মাধ্যমে সম্পর্কিত করা হয়, যাদের চিহ্ন বলেছেন হল (১৯৯৭)। একই সংস্কৃতির মধ্যে মস্তিষ্কে তৈরি হওয়া ধারণাগুলো চিহ্নের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। এই চিহ্ন পরে বাচনিক ও অবাচনিক উপায়ে ভাষায় সংগঠিত হয়। এভাবে একই ভাষার মানুষ নিজস্ব ধারণা ও চিহ্নের মাধ্যমে ব্যক্তি, বস্তু ও ঘটনার ওপর অর্থ আরোপ করে। একে রেপ্রিজেন্টেশনের নির্মাণবাদী তত্ত্ব বলা হয়েছে। তাই নির্দিষ্ট কোনো চিহ্নকে অর্থ বহন করার ক্ষেত্রে সংকেতলিপিকে এর ওপর প্রযুক্ত হতে হবে।

রেপ্রিজেন্টেশন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সেমিওলোজি ও ডিসকোর্সের ধারণাও সামনে আসে। সুইস ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দি সস্যুর দ্বারা নির্মাণবাদী তত্ত্বটি প্রভাবিত। কুলার (উদ্ধৃত হল, ১৯৯৭: ১৬) বলেছেন, সস্যুরের মতে, ভাষার ওপর অর্থের উৎপাদন নির্ভরশীল। ভাষা হলো চিহ্ন পদ্ধতি। অর্থাৎ, ভাষার মধ্যে থাকা শব্দ কী উপায়ে চিহ্ন হিসেবে কাজ করে তার ভিত্তিতে রেপ্রিজেন্টেশনকে বোঝা যায়। সস্যুরের এই চিহ্ন অধ্যয়ন বিজ্ঞানের মাধ্যমে চিত্র, আলোকচিত্র, বিজ্ঞাপন, শব্দ ইত্যাদি রেপ্রিজেন্টেশন বোঝা সম্ভব। আর এ ধারণা থেকে বৃহত্তর অর্থে ডিসকোর্স সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন মিশেল ফুকো। তিনি ডিসকোর্স বলতে সামাজিক জ্ঞানের উৎপাদনকে বুঝিয়েছেন, যা সামাজিক চর্চা ও ক্ষমতার প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত। ফুকো রেপ্রিজেন্টেশন পদ্ধতি হিসেবে ভাষার বদলে ডিসকোর্সকে পাঠ করেছেন।

এদিকে ফুকো (উদ্ধৃত হক অনূ., ২০১৫: ৬০) জানান, ডিসকোর্সের মধ্যে অর্থ ও তার চর্চা নির্মাণ হয়। এর অর্থ হলো, মানুষের ধারণাগুলো কীভাবে চর্চায় যোগ হয়, কীভাবে তা আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয় সে বিষয়কে প্রভাবিত করে ডিসকোর্স। হল (১৯৯৭) বলেন, ফুকো ডিসকোর্সের মাধ্যমে জ্ঞান ও অর্থের উৎপাদন সম্পর্কে সচেতনভাবে কাজ করেছেন। তবে তাঁর কাজের ধরন রেপ্রিজেন্টেশনের নির্মাণবাদী তত্ত্বকে অনুসরণ করে। যদিও রেপ্রিজেন্টেশনের চেয়ে ডিসকোর্সের ধারণা আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। এখানে ভাষা ছাড়াও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুশাসন ও নিয়ন্ত্রণের মতো উপাদান নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব।

ফেয়ারক্লাউ (উদ্ধৃত গায়েন, ২০১৩: ৫৭) বলেন, রেপ্রিজেন্টেশনের ক্ষেত্রে যে বিষয়ের রেপ্রিজেন্টেশন বিশ্লেষণ করা হবে, সেখানে কোন বিষয়গুলো আলোচনায় আছে, কোন বিষয়গুলো নেই এবং কোন বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে ও তার প্রেক্ষাপট কী, তা বুঝতে হবে। সে জন্য তিনি বিষয় বা ঘটনা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্টদের পরিচিতি নির্মাণ ও তাদের উপস্থাপনের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এর কারণ হিসেবে ফেয়ারক্লাউ মনে করেন রেপ্রিজেন্টেশন, ব্যক্তির পরিচয় ও সম্পর্কের সঙ্গে এই প্রশ্নগুলো যুক্ত । এ ছাড়া ডিসকোর্স বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিষয়ে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গণমাধ্যম কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক পরিচয় ও সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করে এবং নানামুখী বিশ্বাস ও মূল্যবোধের জ্ঞান উৎপাদন করে সেটি বোঝা সম্ভব হয়। গণমাধ্যমে উৎপাদিত টেক্সট এসব বিষয় নির্মাণ করে যার সঙ্গে রেপ্রিজেন্টেশনের সাযুজ্য আছে। টেক্সট এসব কাঠামো নিমার্ণ করে আর ভাষা সমাজে বিদ্যমান জ্ঞানকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্বের মাধ্যমে জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে উৎপাদিত টেক্সট সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এসব টেক্সট শ্রেণি সম্পর্কে কী ধারণা তৈরি করছে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য, বিশ্বাস, মূল্যবোধ কীভাবে নির্মিত হচ্ছে, উপস্থাপন করা হচ্ছে সেটির কারণ বুঝতে এই তত্ত্ব সাহায্য করবে।

২.২.৪ সেমিওলোজি (চিহ্নবিজ্ঞান)

চলচ্চিত্র পাঠের ক্ষেত্রে সেমিওলোজি বা চিহ্নবিজ্ঞানের ব্যবহার শুরু হয় ১৯৬০ এর দশকে। চিহ্নবিজ্ঞান হলো চিহ্নের অধ্যয়ন। ভাষা বিজ্ঞান থেকে এই পাঠ শুরু। আমেরিকান দার্শনিক চালর্স স্যান্ডার্স পিয়েরস এবং সুইস ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দি সস্যুর এর প্রবক্তা। সস্যুর (১৯৫৯) ভাষাকে চিহ্ন পদ্ধতি হিসেবে বলেছিলেন। তাঁর মতে, ভাষার উপর নির্ভর করে অর্থ। অর্থাৎ, অর্থ তৈরি হয় ভাষার মাধ্যমে। ইতিহাস ও সংস্কৃতি অর্থ তৈরিতে ভূমিকা রাখে। মানুষ একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে বা কোনো বিষয়ে ধারণা প্রকাশ করতে ভাষার ব্যবহার করে। বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুযায়ী, শুধু মৌখিক পদ্ধতি মানেই ভাষার প্রকাশ নয়, শব্দ, চিত্রকলা, আলোকচিত্র, বস্তু ইত্যাদির মাধ্যমেও অনেক কিছু প্রকাশ করা যায়। এগুলো চিহ্ন হিসেবে ভাষার মধ্যে কাজ করে। তাই সংস্কৃতিকে ভাষা হিসেবে ও সংস্কৃতিতে থাকা চিহ্নকে পাঠ করার পদ্ধতিকে বলা হয় সেমিওটিকস। মূলত সেমিওটিকস ভাষা, শব্দ, চিত্র-এর উপস্থাপনের ওপর জোর দেয়।

হল (উদ্ধৃত হক অনূ., ২০১৫: ৪১) জানান, সস্যুর এখান থেকেই দ্যোতক (Signifier) ও দ্যোতিত (Signified) দুইটি উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখান। দ্যোতক বলতে তিনি বুঝিয়েছেন প্রকৃত আলোকচিত্র, শব্দ, চিত্র ইত্যাদিকে এবং দ্যোতিত বলতে কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে মানুষের মস্তিষ্কে থাকা ধারণাকে। তিনি বলেছেন, একই সংস্কৃতিতে থাকা মানুষের মধ্যে ভাষার সংকেতলিপির মাধ্যমে অর্থ তৈরি হয়। তবে মানুষের মাথায় থাকা ধারণা সময়ভেদে পরিবর্তন হতে পারে। শব্দের অর্থও সেভাবে পরিবর্তন হয়। এ বিষয়ে ফরাসি তাত্ত্বিক রোঁলা বার্থ, নৃবিজ্ঞানী ক্লড লেভি স্ট্রস, উমবার্তো উকো প্রমুখ কাজ করেছেন। উকো (উদ্ধৃত চ্যাডলার, ২০০২: ১৬) বলছেন, দ্যোতিত বিষয়টি এক ধরনের কল্পনা, ধারণা ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার মধ্য থেকে তৈরি হয়।

ফরাসি চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক ক্রিশ্চিয়ান মেজ সেমিওলোজিকে চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। মেজ (১৯৭৪) দেখান, কীভাবে সংকেতলিপির মাধ্যমে চলচ্চিত্রকে বিশ্লেষণ করা যায়। তাঁর মতে, চলচ্চিত্র বাস্তবতার অনুভূতি দেওয়ার কারণে দর্শকের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এখানে উপস্থিত দৃশ্যগুলোর বাস্তবতার সাথে এক ধরনের আবেদন ও নৈকট্য থাকে বলে মানুষকে আকৃষ্ট করে। তারপরও এই মাধ্যমকে একটি সুনির্দিষ্ট বিভ্রম ছাড়া অন্য কিছু বলে মনে করেন না তিনি। চলচ্চিত্রে কীভাবে বিভিন্ন ইমেজ ব্যবহার করে দৃশ্য বিন্যস্তের মাধ্যমে অর্থ উৎপাদন হয় তা নিয়ে মেজ আলোচনা করেছেন। ন্যারেটিভ কাঠামোর মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র কীভাবে উপস্থাপিত হয় অর্থাৎ এটিকে একটি অর্থবহ কাঠামো হিসেবে বিশ্লেষণ করার পক্ষে ছিলেন তিনি। তিনি মনে করেন, চলচ্চিত্রের ভাষা হলো ইমেজ। আর ইমেজের মাধ্যমে চলচ্চিত্রকে বোঝা সম্ভব। প্রতিটি চলচ্চিত্র সংকেতলিপির সমাহারে তৈরি হয়। এই সংকেতলিপি ডিসকোর্স তৈরি করে। মেজ (উদ্ধৃত গায়েন, ২০১৩: ৫৫) বলেছেন, বর্ণনাত্মক রীতি থেকে বেরিয়ে কোনো সংকেতের ওপর গভীর কোনো অর্থ আরোপিত হতে পারে। যেমন, 'গোলাপ' একটি ফুল হলেও এর সংকেত সম্প্রসারিত অর্থে হয়ে উঠেছে অনুরাগ এর মতো অনুভূতি। এই নতুন অর্থ দিয়েছে সংস্কৃতি। নির্দিষ্ট দেশের, নির্দিষ্ট সংস্কৃতির বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও মতাদর্শের সাপেক্ষে এভাবে কোনো বিষয় বা বস্তুর প্রাথমিক অর্থের বাইরেও নতুন অর্থ তৈরি হয়।

তবে এর আগে সেমিওটিক মনোভঙ্গিতে জনসংস্কৃতিকে পাঠ করেছিলেন বার্থ (১৯৫৭)। বার্থ (১৯৫৭) দেখিয়েছেন সংস্কৃতিতে থাকা যেকোনো কিছুই চিহ্ন হতে পারে এবং সেটি নির্দিষ্ট বার্তা দেয়। তাঁর দেওয়া

তত্ত্বের মাধ্যমে সেমিওটিকের প্রয়োগ আরও ব্যপ্তি লাভ করে। কারণ তিনি এ তত্ত্বকে ভাষাবিজ্ঞান থেকে আলোকচিত্রের আলোচনায় নিয়ে আসেন। ভিজ্যুয়াল অবজেক্টে থাকা চিহ্নকে বিশ্লেষণ করতে তিনি ডিনোটেশন ও কনোটেশন-এ দুইটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। এটি দ্যোতক ও দ্যোতিতের মধ্যকার সম্পর্ককে বর্ণনা করতে সাহায্য করে । তিনি *প্যারিস ম্যাচে* প্রকাশিত ফরাসি পতাকাকে স্যালুট দিচ্ছেন একজন কালো সৈনিক-এমন একটি ছবি বিশ্লেষণ করে দেখান। প্রাথমিকভাবে একজন সৈনিক ফরাসি পতাকাকে সম্মান জানাচ্ছেন এমনটি মনে হবে। কিন্তু ইতিহাস ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা করলে এর অন্তর্নিহিত অর্থ জুড়ে যায় ফরাসি উপনিবেশবাদের সঙ্গে। বার্থ (উদ্ধৃত হল, ১৯৯৭: ২৪) বলছেন, এখানে আসলে ফরাসি উপনিবেশিত কালো সৈনিক তার অধিপতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে।

চ্যাডলারের (২০০২) মতে, ডিনোটেশন হলো চিহ্নের প্রাথমিক বর্ণনাধর্মী পর্যায় আর কনোটেশন হলো সাংস্কৃতিক ধারণা। কনোটেশন সাধারণত প্রেক্ষাপট নির্ভর। এর সাথে ব্যাখ্যাকারীর শ্রেণি, জেন্ডার, জাতিসত্তা অনেক কিছু জড়িত থাকে। দ্যোতক ও দ্যোতিতের মধ্যকার সম্পর্ক বোঝাতে সেমিওটিকে এই দুইটি টার্ম ব্যবহার করা হয়। যেমন, পোশাক বলতে শরীরের পরিধান করার জিনিস বা বস্ত্র বোঝায়। কিন্তু সাংস্কৃতিক অর্থে এটি আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক অথবা অভিজাত বা সাধারণ অর্থে ভাগ হয়ে যায়।

আগেই বলা হয়েছে, চলচ্চিত্রের ভাষা হলো ইমেজ বা চিত্র। দৃশ্য বিন্যাসের মাধ্যমে এখানে অর্থ তৈরি হয়। এ গবেষণায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি নির্মাণের পেছনের সংকেতলিপি কীভাবে কাজ করে সেটি বোঝার জন্য এই তত্ত্বের ব্যবহার হবে।

২.২.৫ ডিসকোর্স (অভিতর্ক)

ভাষাতাত্ত্বিক ধারণা হিসেবে ডিসকোর্স বা অভিতর্ক ব্যবহার হয়ে থাকে। ফেয়ারক্লাউ (১৯৯৫) এর মতে, ডিসকোর্স হলো এক ধরনের নতুন জ্ঞান। বাস্তবতার সামাজিক নির্মাণ। একে জ্ঞান অনুসন্ধানের পদ্ধতিও বলা যায়। রোজ (২০০১) বলছেন, ডিসকোর্স হলো একগুচ্ছ বিবৃতি যা কোনো কিছু নিয়ে চিন্তার পথ তৈরি করে এবং সে চিন্তা অনুযায়ী আমরা কাজ করি।

ডিসকোর্স সম্পর্কে ফরাসি দার্শনিক ও উত্তর আধুনিক চিন্তাধারার অন্যতম পুরোধা মিশেল ফুকোর আলাদা ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন হল (১৯৯২)। তিনি বলেন, অতীতে সস্যুরের সেমিওটিক তত্ত্ব অনুযায়ী রেপ্রিজেন্টেশনকে বোঝার চেষ্টা করা হতো ভাষায় উপস্থিত শব্দ কীভাবে চিহ্ন হিসেবে কাজ করে তার ভিত্তিতে। কিন্তু পরে দেখা যায়, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে চিত্র, বক্তব্য, বর্ণনা ইত্যাদির ওপরও অর্থ নির্ভর করে। ফুকো ডিসকোর্সকে পাঠ করেছেন রেপ্রিজেন্টেশন পদ্ধতি হিসেবে। তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ে বিবিধ নিয়মকানুন ও চর্চার মাধ্যমে উঠে আসা অর্থপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রিত বিবৃতি। তাই কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে ডিসকোর্স হলো কতিপয় বিবৃতি যা আলোচনা করার ভাষা প্রদান করে, উপস্থাপনের উপায় খুঁজে দেয়, ওই আলোচনা সম্পর্কে এক ধরনের সুনির্দিষ্ট জ্ঞান উৎপাদন করে। তাঁর মতে, ভাষার মাধ্যমে যে জ্ঞান তৈরি হয় তাই হলো ডিসকোর্স। আর যেহেতু সামাজিক চর্চাগুলো মানুষের ওপর অর্থ আরোপ করে এবং প্রভাবিত করার চেষ্টা করে তাই সব চর্চার একটি ডিসকার্সিভ গঠন আছে ।

কোনো বিষয়ে আলোচনার উপায় যেমন নির্ধারণ করে দেয় তেমনি ভিন্নধর্মী আচরণ ও জ্ঞান উৎপাদনকে বাতিলও করে দেয় ডিসকোর্স। ফুকোর (উদ্ধৃত তুষার, ২০১৯) মতে, ক্ষমতা জ্ঞান তৈরি করে এবং প্রচলিত

জ্ঞান ক্ষমতাকে বৈধতা প্রদান করে। এর একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কোন পরিস্থিতিতে মানুষ কীভাবে ভাববে, কী বলবে তার রাজনৈতিক বিন্যাসকে মূলত ডিসকোর্স বলে অভিহিত করা যায়। নিয়ন্ত্রকের ভাষাই সব সময় সবার চিন্তায়-মননে ঢুকে পড়ে। এর ফলে মতাদর্শ, মূল্যবোধ- সব কিছু শাসকশ্রেণি দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবার ক্ষমতার পালা বদলে ভাষাও বদলে যায়। তাই ডিসকোর্সে দেখা হয়, কার স্বার্থে কোন ডিসকোর্স টিকে আছে।

ফুকো (উদ্ধৃত রাবিনোও, ১৯৯১: ৭৫) ক্ষমতার ক্ষেত্রে সত্যের শাসনের কথা উল্লেখ করেছেন। ফুকোর মতে, সব সমাজে সত্যের শাসন বিদ্যমান। ডিসকোর্সের মাধ্যমে এই সত্যের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শ প্রবাহের মাধ্যমে এটি শক্তিশালী হয়ে ওঠে বা পুনরায় সংজ্ঞায়িত হয়। ১৯৭৯ সালে ফ্রান্সে ফুকোর দেওয়া একটি বক্তৃতায় এর বিস্তারিত পাওয়া যায়।[৫]

ওডাক (১৯৯৬) বলছেন, সমাজের বাস্তবতা নির্মাণ, মধ্যস্থতা করা ও সমাজ- সংস্কৃতির মৌলিক বিষয়গুলো বুঝতে সাহায্য করে ডিসকোর্স। আর এটি নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই মতাদর্শ ও ক্ষমতার প্রসঙ্গ চলে আসে। আবার প্রত্যেক ডিসকোর্সের নির্দিষ্ট ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক নিয়ম আছে, যা অন্যসব ডিসকোর্সের ওপর কর্তৃত্ব করে। যেমন, পশ্চিমা সমাজে পিতৃতন্ত্র সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি ডিসকোর্স। এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আরেকটি ডিসকোর্স হচ্ছে নারীবাদী ডিসকোর্স। এই ডিসকোর্স পূর্ববর্তী ডিসকোর্সকে চ্যালেঞ্জ করলেও এর ওপর সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব বজায় থাকে।

মূলত ভাষার মাধ্যমে ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায় বলছেন ভূঁইয়া (তারিখবিহীন)। যাকে ফুকো 'সত্য' বলছেন বলে জানান তিনি। এর অর্থ হলো, ক্ষমতাসীনরা তাদের অনুকূলে ভাষার ভাষা নির্মাণ করে। তাতে তাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য সমাজে টিকে থাকে। প্রত্যেকটি সমাজে মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, ভাবে বা আচরণ প্রকাশ করে তা ক্ষমতাসীনদের তৈরি। ক্ষমতা জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান, বলেছেন ফুকো (১৯৭৮)। তবে ক্ষমতার সম্পর্ককে তিনি শ্রেণি বা রাজনৈতিক সম্পর্কের মতো বিচার করার পক্ষে ছিলেন না। নারী-পুরুষের সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক-সব ধরনের সম্পর্ক মিলে রাষ্ট্র তার কাজ করে বা কাজ নির্ধারণ করে। এই ধরনের প্রতিটি সম্পর্ক ক্ষমতা বিশ্লেষণের এক একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচিত। তাঁর মতে প্রতিষ্ঠান ক্ষমতা তৈরি করে না, ক্ষমতাই বরং প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। তাই প্রতিষ্ঠান শুধু ক্ষমতার চর্চা অব্যাহত রাখে। তবে ফুকো ক্ষমতার প্রভাবকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি (১৯৭৭) বলছেন, ক্ষমতা শুধু বাতিল করে বা দমন করে, আড়াল করে কিংবা মুখোশ পরিয়ে দেয়-এমনটি নয়। ক্ষমতা বাস্তবতা নির্মাণ করে। পাশাপাশি কার্যক্ষেত্রের উদ্দেশ্য ও সত্যের রীতিনীতিও তৈরি করে।

ডেলান্টি (২০০০) জানাচ্ছেন, ইতিহাসকে পাঠ করার ক্ষেত্রে ফুকোর বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে ফুকো নিজেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'কাউন্টার-হিস্ট্রিস' বলে। আমরা যেমন ইতিহাস বলতে মনে করি অতীতের কোনো সত্য ঘটনার বর্ণনা, যা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। সেই সঙ্গে ইতিহাস; এক ধরনের স্মৃতির কাঠামো হিসেবে

[৫]. ১৯৭৯ সালে ফুকোর বক্তৃতার একটি অংশ What is at stake in this research: the coupling of a set of practices and a regime of truth and the effects of its inscription in reality. What is liberalism? এ সত্যের শাসন বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে কলেজ দ্য ফ্রান্স এ দেওয়া ফুকোর বক্তৃতার সংকলন *The Birth of Biopolitics* গ্রন্থে এ বক্তৃতাটি সংকলিত আছে ।

বিবেচিত, যাকে ফুকো ভাঙতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইতিহাসের সকল রূপ ডিসকোর্সের অংশ এবং এর মাধ্যমে উদ্ভূত ।

ফুকো (উদ্ধৃত ফেয়ারক্লাউ, ১৯৯২: ৪০) বলছেন, ডিসকোর্স বিশ্লেষণের বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে বক্তব্যগুচ্ছ বিশ্লেষণ। এই বক্তব্যগুচ্ছকে মৌখিক পরিবেশনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া কোনো প্রস্তাবনার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ, বাক্যের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ, মনস্তাত্ত্বিক বা সংকেতের প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেও ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করা যায়। তবে বক্তব্য বা বিবৃতিগুচ্ছের বিশ্লেষণ অন্যান্য বিশ্লেষণকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। এ ছাড়া তিনি এটিও মনে রাখতে বলেছেন, ডিসকোর্স বিশ্লেষণ আর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে সমানভাবে গণ্য করা যাবে না। সেই সঙ্গে আলোচনায় কী ধরনের বাক্য বা ব্যাকরণ ব্যবহার সম্ভব তা সুনির্দিষ্ট করা সম্পর্কে ডিসকোর্স বিশ্লেষণ বলে না, বরং আর্থ-রাজনৈতিকভাবে পরিবর্তনশীল ডিসকার্সিভ গঠন নির্দিষ্ট করার বিষয়ে কাজ করে।

ডিসকোর্স বিশ্লেষণ সম্পর্কে থোয়েটস এবং অন্যান্য (১৯৯৪)- এর মত হলো, এখানে আলোচ্যবস্তুর ভাষা ব্যবহারের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। কী ভাষা লিখিত বা বলা হচ্ছে, কী চিন্তাধারা উঠে আসছে, সামাজিক প্রক্রিয়ায় কীভাবে ধারণাগুলো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেগুলো দেখার চেষ্টা এখানে করা হয়। ডিসকোর্স না বুঝলে বাস্তবতা বা নিজেদের বোঝা সম্ভব নয়।

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনায়ন

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনায়ন

এই গবেষণা একটি গুণগত গবেষণা। গুণগত গবেষণার মাধ্যমে জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপায়নের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করা হবে। এ জন্য রেকর্ড কোম্পানি জি সিরিজ ও লেজার ভিশন থেকে চলচ্চিত্রগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে একটি পদ্ধতি হিসেবে ডিসকোর্স বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। ডিসকোর্স বিশ্লেষণ বলতে বোঝায়, ভাষার মাধ্যমে যে জ্ঞান তৈরি হয়। ম্যাথিউস ও রস (২০১০) বলেন, ডিসকোর্স বিশ্লেষণ তাত্ত্বিকভাবে সামাজিক বিনির্মাণ তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এই পদ্ধতির মূল ভিত্তি হলো টেক্সট, যা লিখিত বা মৌখিক হতে পারে। তাঁরা বলছেন, ডিসকোর্স বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভাষা নিয়ে বা ভাষাবিদ্যা নিয়ে কাজ করা হয়। যেখানে গবেষকেরা দেখেন কোন পরিস্থিতিতে কী ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে, টেক্সটের ভেতরে কোন ধারণাগুলো লুকিয়ে আছে এবং সেগুলো কীভাবে ভাষার মাধ্যমে উপস্থাপিত হচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সময়ে মানুষের ধারণা, চিন্তা বা অনুভূতি বিকশিত হয় কিংবা কীভাবে সেগুলো ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও চিন্তার মাধ্যমে সামাজিকভাবে নির্মিত হয় সেটিও দেখা হয়। বার্ক (২০০৫)-এর মতে, ভাষা এমন কোনো নিরপেক্ষ মাধ্যম নয় যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। ব্যক্তি তার আশপাশের পৃথিবী সম্পর্কিত ধারণা তৈরি করতে গঠনমূলক ভাষা ব্যবহার করে। একে ডিসকোর্স বিশ্লেষণের একটি প্রাথমিক নীতি বলে মনে করেন তিনি।

এই ডিসকোর্স বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমে নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলোতে কতগুলো ডিসকোর্স আছে সেটি অনুসন্ধান করা হবে। এরপর চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত চরিত্রগুলোর সংলাপ বিশ্লেষণ করা হবে। সংলাপের ক্ষেত্র বাছাইকৃত অংশ নিয়ে কাজ পরিচালিত হবে। একই সঙ্গে সেমিওটিক পদ্ধতিতে ইমেজ বিশ্লেষণ করার জন্য ইমেজ নির্বাচন করা হবে। এতে দৃশ্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত ডিসকোর্স বোঝা সম্ভব হবে। গবেষণায় ডিসকোর্স বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনটি চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করা হবে। ডিসকোর্স বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রেণি তত্ত্ব, বর্ণনতত্ত্ব, সেমিওলোজি তত্ত্বের কিছু অংশ সাহায্য করবে।

৩.১.১ নমুনায়ন

জহির রায়হান ৯টি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন। যুগ্ম পরিচালনায় নির্মাণ করেছেন একটি চলচ্চিত্র। এ গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে তিনটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নেওয়া হয়েছে। এখানে সেসব চলচ্চিত্রগুলো নেওয়া হয়েছে যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ঘিরে গল্প আবর্তিত হয়েছে। এ ছাড়া দুই ধরনের সময়ের প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্র তিনটি বাছাই করা হয়েছে। এরমধ্যে দুইটি চলচ্চিত্র ৬০- এর দশকে এবং একটি ৭০- এর দশকে নির্মিত। তিনটির মধ্যে একটি চলচ্চিত্র উপন্যাসভিত্তিক।
চলচ্চিত্রগুলো হলো:

১. কখনো আসেনি (১৯৬১)
২. আনোয়ারা (১৯৬৭)
৩. জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০)

আনোয়ারা চলচ্চিত্রটি উপন্যাসভিত্তিক এবং গ্রামীণ পটভূমিতে চিত্রায়িত। *কখনো আসেনি* ও *জীবন থেকে নেয়া* চলচ্চিত্র দুইটি শহুরে পটভূমিতে নির্মিত হয়েছে।
এ ছাড়া এই চিত্র পরিচালকের অন্যান্য চলচ্চিত্র যেমন, *সোনার কাজল* (১৯৬২) নিম্ন মধ্যবিত্ত ও *কাঁচের দেয়াল* (১৯৬৩) মধ্যবিত্ত পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। এ ছাড়া *সোনার কাজল*- এর গল্প আবর্তিত হয় এক নিম্নবিত্তের অধরা স্বপ্ন ও চাকরি পাওয়া এক তরুণের উচ্চাশা নিয়ে। *কাঁচের দেয়াল* এর কাহিনি গড়ে ওঠে একটি মধ্যবিত্ত সংসারে অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের ভিত্তিতে বয়ে চলা সম্পর্কদের নিয়ে। যেখানে সম্পর্কের মাঝে দেয়াল তুলে রাখে অর্থ, এ সম্পর্ক কাঁচের মতোই ভঙ্গুর বলে সহজে ভেঙে পড়ে।

৩.২ বিশ্লেষণের একক

গবেষণার জন্য নমুনা হিসেবে নেওয়া তিনটি চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলোর শ্রেণি প্রকৃতি। এখানে চরিত্রগুলোর সামাজিক পরিচয় ও অবস্থান, তাদের জীবনযাত্রা, চিন্তা-ধ্যানধারণাসহ কীভাবে তাদের উপস্থাপিত করা হয়েছে সেটি দেখা হবে।

৩.৩ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলো জি সিরিজ ও লেজার ভিশন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি চলচ্চিত্র গবেষক দেখেছেন। এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি নোট নিয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে কাহিনীর পটভূমিসহ সামগ্রিক চরিত্রাঙ্কন দেখা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয়বার নির্দিষ্ট করে দেখা হয়েছে সংলাপ, শব্দ, অভিব্যক্তি, সাজসজ্জা, ইমেজ। তবে গবেষণাটি পরিচালনার সময় গবেষককে কিছু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পুরোনো চলচ্চিত্র হওয়ায় চলচ্চিত্রের প্রিন্ট তেমন ভালো ছিল না। সংলাপও কিছু কিছু জায়গায় অস্পষ্ট শোনা গেছে। এর মধ্যেই সতকর্তার সাথে চলচ্চিত্রগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.৪ তথ্য (চলচ্চিত্র) বিশ্লেষণ

তিনটি চলচ্চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্রেণি ঝোঁক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি উপস্থাপনের স্বরূপ কেমন সেটি দেখা হবে। শ্রেণি ঝোঁক সম্পর্কে আলোচনার আগে বলা যায়, মার্কস, ওয়েবার প্রমুখ তাত্ত্বিকদের মতে, সামাজিক শ্রেণির মূল ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক। এ সম্পর্কে সেন (১৯৮৫) বলেন, শ্রেণি সম্পর্ক নির্ধারিত হয় উৎপাদন সম্পর্ক ও অস্থাবর সম্পত্তির ভিত্তিতে। এখানে মর্যাদা গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা যায় অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ ও জীবনযাত্রার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কারণ শ্রেণি কাঠামোতে বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে অনেক মর্যাদা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে-এই বিষয়টি মর্যাদার ভিত্তিতে তৈরি স্তরবিন্যাস স্বীকার করে। পাশাপাশি বিভিন্ন রকম সামাজিক স্তর সম্পর্কে নতুন ধারণা দেয়। ডেভিস ও মুর (১৯৪৫) এর মতে, সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে সামাজিক কাঠামোতে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের একটি নির্দিষ্ট স্থানে থাকবে। সমাজ এসব সদস্যদের নানা উপায়ে সামাজিক অবস্থানগুলো ভাগ করে দেবে এবং সদস্যরাও ওই অবস্থান অনুযায়ী নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে।

সেইসঙ্গে শ্রেণি সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্রে এরন (উদ্ধৃত সেন, ১৯৮৫: ৭) বলেন, সমাজে বিদ্যামান সামাজিক ব্যবধান এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার পার্থক্যের ভিত্তিতে এলিট ও সামাজিক শ্রেণির মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপন করা যায়।

বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণি সংক্রান্ত আলোচনায় সেন (১৯৮৫) জানাচ্ছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন বাংলার সামাজিক স্তরবিন্যাসে পরিবর্তন আনে। বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার উদ্দেশ্যই ছিল ভদ্রলোক শ্রেণি তৈরি করা। গ্রাম ও শহর-উভয় ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন চোখে পড়ে। ফলে গ্রামের মধ্যস্বত্বভোগী পরিবারগুলো থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত চাকুরিজীবী, ডাক্তার, সাংবাদিক প্রভৃতি পেশার মানুষ তৈরি হয়। এতে করে এ ধরনের বাঙালি শ্রেণি মধ্যবিত্তের তকমা পেয়ে যান। বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের আবির্ভাবও কৃষক সমাজ থেকেই শুরু। পরে সেখান থেকেই আবার এই শ্রেণি উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত- এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর সামাজিক কাঠামোতে আবারও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অর্থ ও সম্পদের ভিত্তিতে ব্যক্তির সম্মান নির্ধারণ হতে থাকে। মুসলমানদের মধ্য থেকে জমির মালিক, ব্যবসায়ী ও নানা পেশার মানুষের সম্বনয়ে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে। যারা আগের চেয়ে শক্তিশালী ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় মূলত সম্পদ ও পেশাগত মর্যাদা সামাজিক স্তরবিন্যাস করার ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে বলে দাবি করেন সেন (১৯৮৫)।

অন্যরকম বিশ্বাস ও আর্দশ মধ্যবিত্ত ধারণ করে বলে দাবি করেন পান্ডা (২০১৮)। শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকাই যে জীবন নয় সেটার ধারক ও বাহক মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তারা শিক্ষা, শিল্পসাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিজেদের যুক্ত করে। রাজনীতিতেও নেতৃত্ব দিয়েছে মধ্যবিত্ত।

শ্রেণি, সামাজিক স্তরবিন্যাস ও মধ্যবিত্ত-সম্পর্কিত এই ধারণাগুলো জহির রায়হানের নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলোতে কীভাবে আলোচনায় উঠে এসেছে এবং মধ্যবিত্তের ডিসকোর্স কীভাবে নির্মিত হয়েছে তা জানতে চলচ্চিত্রগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা হবে।

৩.৪.১ *কখনো আসেনি* (১৯৬১)

জহির রায়হান পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র *কখনো আসেনি* প্রযোজনা করেন আজিজুল হক ও মঞ্জুরুল হক। এতে অভিনয় করেছেন সুমিতা দেবী, খান আতাউর রহমান, সঞ্জীব দত্ত, শবনম প্রমুখ।

কখনো আসেনি-কে একটি মনো-সামাজিক চলচ্চিত্র বলা যায়। এখানে পারিবারিক বন্ধন, মানসিক টানাপোড়েন, প্রেম-ভালোবাসা, শ্রেণি দ্বন্দ্বের গল্প যেমন আছে, তেমনি মনস্তাত্ত্বিক কিছু বিষয়ও উঠে এসেছে। চলচ্চিত্রের এখানে দুইটি কাহিনি আছে, একটি হলো এই চলচ্চিত্রের প্রধান চরিত্র বা নায়ক শওকত ও তার পরিবারের গল্প। আরেকটি হলো খলচরিত্র সুলতান ও তার মিউজিয়াম এবং ওই মিউজিয়ামের অন্যতম সংগ্রহ মরিয়ম- এর গল্প।

কাহিনি সংক্ষেপ

গল্পের শুরুতে দেখা যায়, দোতলা একটি বাড়িতে দুইজন নারীর লাশ পড়ে আছে। খবর পেয়ে পুলিশের দল এসে দেখে লাশ দুইটির পাশে একটি আঁকা ছবি। ওই ছবিতে হুবহু একই ভঙ্গিমায় দুইটি লাশ পড়ে আছে । সেই সাথে পাশে আরেকটি ছবিতে একজন নারী দেখা যাচ্ছে, যিনি লাশ দুইটির দিকে তাকিয়ে আছেন। পুলিশ জানতে পারে মৃত নারীদের একজন বড় ভাই আছেন। সে সময় পুলিশ প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন ভাইটি বাড়িতে নেই। রাতের কোনো এক সময়ে সে বাড়িতে ফিরলে এক প্রতিবেশী খবরটি

পুলিশকে জানান। এর ভিত্তিতে ভাইটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশ ওই বাড়িতে প্রবেশ করলে তাকেও মৃত অবস্থায় পায়। সে সময় পাশের বাড়ির বারান্দা থেকে এক নারী ওই দৃশ্য দেখতে থাকে।

অনেক বছর পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। চলচ্চিত্রের প্রধান চরিত্র শওকত তাঁর বাবা আর দুই বোনকে নিয়ে ওই বাড়িতে ওঠে। মধ্যবিত্ত পরিবারটির একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি শওকতের বাবা। শওকত একজন শিল্পী আর দুই বোন সংসার সামলে রাখে। সংসার চালানোর জন্য শওকতের বাবা বৃদ্ধ বয়সেও চাকুরি করেন। তাকে চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার জন্য নানান সময় প্রতিষ্ঠান চাপ দিতে থাকে। কিন্তু তিনি ছাড়তে রাজি হননি। এদিকে শওকত ছবি আঁকে আর অবসরে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়। ঘরে বোনদের সাথে গল্প করে, গান শোনায়।

এদিকে শওকতের বোনরা মাঝে মাঝে পাশের বাড়ি থেকে গভীর রাতে কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়। শুরুতে অশরীরী আর্তনাদের মতো হলেও পরে তারা বুঝতে পারে, ওই বাড়িতে থাকা কোনো নারী কষ্ট পেয়ে কাঁদছেন। ঘটনাক্রমে ওই বাড়ির মালিক সুলতানের সাথে শওকতের পরিচয় হয়। সুলতান শিল্প সংগ্রাহক। ন্যায়-অন্যায় নানা পদ্ধতিতে তিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহ করেছেন। তার মতে, জাদুঘরের সবচেয়ে বড় ও সুন্দর শিল্প হলো একজন নারী, যার নাম মরিয়ম। রক্ত-মাংসের মরিয়মকে তিনি বন্দী করে রাখেন। সদা সর্তক থাকেন মরিয়মকে কেউ যেন ছিনিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, ছুঁতে না পারে। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, সুন্দরকে শুধু অনুভব করা যায়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না। তবে কোনো কিছুই মরিয়মকে আটকে রাখতে পারে না। একপর্যায়ে শওকতের সাথে তার ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এক সময় শওকতের বাবাকে কর্মস্থল থেকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। বাড়ির কেউ তা জানতে পারে না। বাবা শওকতকে জানাতে চাইলেও সুযোগ পান না। কারণ শওকত তখন ছবি আঁকার জন্য গ্রামে চলে গেছে। শওকতের কাছে শিল্পের অর্থ বাস্তবতা। রঙ-তুলিতে সে পেশীবহুল শ্রমিকের ছবি আঁকে, দুই নারীর হাতে শান্তির পায়রার ছবি আঁকে। শিল্পীসত্তা দিয়ে সে পৃথিবীর বাস্তবতাকে তুলে ধরে। কিন্তু নিজের পরিবারের বাস্তবতাকে সে লক্ষ্য করে না। একসময় তার বাবা হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা গেলে বাস্তবতা শওকতকে কঠিনভাবে আঘাত করে। পুরো পরিবারের দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পড়ে। একটা চাকুরির জন্য শওকত হন্য হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরে। কিন্তু চাকরি মেলে না। সংসারে অভাব- অনটন শুরু হয়। বোনরা ছেঁড়া শাড়ি পড়ে, নিজেরা না খেয়ে ভাইকে খাওয়ায়। কখনো আধপেট, কখনো অভুক্ত অবস্থায় তাদের দিন পার হতে থাকে।

এদিকে মরিয়মও তার বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছটফট করে। কারণ শওকতের সাথে ঘোরাফেরার কারণে সুলতান তাকে নির্যাতন করেন, মূর্তির মতো দাঁড় করিয়ে রাখেন। মরিয়মকে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। একপর্যায়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য শওকতকে মরিয়ম চাপ দিতে থাকে।

একদিকে অভাব, অন্যদিকে অবিবাহিত দুই বোন এবং আরেক দিকে মরিয়ম- সবকিছু নিয়ে শওকত মানসিক চাপে পড়ে। বোনদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। একসময় মরিয়মকে নিয়ে চলে যাচ্ছে এমন একটি চিঠি লিখে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। তবে যাওয়ার আগে দুই বোনের লাশ বিছানায় পাশাপাশি পড়ে আছে এমন ছবি আঁকে। এ ঘটনার পর তার বোনরা আত্মহত্যা করে। শওকত একসময় আবার বাড়ি ফিরে আসে। অনুশোচনা, দুঃখ ও হতাশায় বিষ পানে সেও আত্মহত্যা করে। মারা যাওয়ার আগমূহুর্তে সৃষ্টি হওয়া এক

বিভ্রমে সে দেখতে পায়, আরেক চিত্রশিল্পী মৃত দুই নারীর ছবি আঁকছে। এরপর ওই বাড়িতে আবার নতুন একটি পরিবার আসে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখতে থাকে মরিয়ম।

৬০-এর দশকে সারা বিশ্বে চলমান রাজনৈতিক মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব ও পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসনকালে নির্মিত এ চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়,

প্রাত্যহিক জীবনযাপন

শওকতদের পরিবার একটি সাধারণ শিক্ষিত পরিবার। বাবা, ভাই আর দুই বোনকে নিয়ে সংসার। বাবা চাকুরিজীবী; শওকত শিল্পী এবং বোনেরা শিক্ষিত, কিন্তু ঘরের বাইরের কোনো কাজের সাথে যুক্ত নয়। দোতলা একটি বাড়িতে পরিবারটি ভাড়া থাকে। সকালে খাওয়ার টেবিলে কাঁচের প্লেট, গ্লাস, ছুরি, টি–পট, কাঁচের চায়ের কাপের মতো শৌখিন জিনিস দেখা যায়। শওকত সকালে নাস্তা করে পাউরুটি ও মাখন দিয়ে। তার ঘরের টেবিলে শিল্প সংক্রান্ত মোটা কিছু বই আর পত্রিকা দেখা যায়। এ ছাড়া শওকতের ঘরের দেয়ালজুড়ে তার নিজের হাতে আঁকা নানা চিত্রকর্ম চোখে পড়ে। টেবিল ল্যাম্প, মাটির তৈরি ছোট ছোট মানবমূর্তিও তার ঘরে শোভা পায়।

এর সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের পোশাক পরিচ্ছদও আধুনিক। বাবার পরনে পায়জামা- পাঞ্জাবি, শওকত শার্ট-ব্লেজার; কখনো অনুষ্ঠান অনুযায়ী স্যুট-টাইও পড়ে। পরিবারের নারীদের পরনে সব সময় ভালো শাড়ি। তবে বাবার মৃত্যুও পর সংসারে অভাব দেখা দিলে ছেঁড়া শাড়িতে তাদের দেখানো হয়। কিন্তু শওকতের পোশাকে হেরফের হয় না। এখানে মুসলিম পরিবার হিসেবে পর্দা প্রথার কোনো দৃশ্য নেই। কিশোরী ছোট বোনটি নির্দ্বিধায় সুলতানের বাড়িতে আসে-যায়, মরিয়মের সঙ্গে গল্প করে। শওকতের বাবার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে বাড়িতে পুলিশ এলে বোন দুইটি পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তার সামনে হাজির হয়। অর্থাৎ ৬০- এর দশক এমন একটি সময় যখন নারীরা শিক্ষিত হচ্ছিল, তাদের পোশাক-আশাকে পরিবর্তন এসেছিল এবং আগে ধর্মীয় যে অনুশাসনে নারীরা বাধা পরেছিলেন সেখান থেকে একটু একটু করে বেরিয়ে আসছিলেন।

অন্যদিকে শওকতদের প্রতিবেশী সুলতান একজন শিক্ষিত ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। নিজস্ব দোতলা বাড়িতে তিনি নানা দুষ্প্রাপ্য মূর্তির সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছেন। তার বেশভূষা সব সময় পরিপাটি ও দামি। কখনো স্যুট-টাই, কখনো পাঞ্জাবি তার পরনে দেখা যায়। শিল্প সংগ্রহ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে তিনি অন্যদের তুলনায় বেশি সমাদর পান। সুলতান তার অর্থের ক্ষমতাবলে রক্ত-মাংসের মানুষ মরিয়মকে নিজের সংগ্রহ বলে দাবি করেন। মরিয়মকে তিনি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেন। ভালো শাড়ি ও গহনায় মোড়ানো মরিয়ম সব সময় পরিপাটি এবং উপস্থাপনযোগ্য হিসেবে ঘরে-বাইরে নিজেকে তুলে ধরে।

প্রাত্যহিক জীবনযাপনের দিকগুলো আলোচনা করতে গিয়ে শওকতদের পরিবারের জীবনাচারণের মধ্যে হিসাব ও আপোসকামিতার মতো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে।

হিসাব ও আপসকামিতা

শওকতের বাবার চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। তবু সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় তিনি চাকুরি চালিয়ে যান। এদিকে তিনি হিসাবে ভুল করলে অফিসের বড় সাহেব বকা দেন। দেরি

করে অফিসে পৌঁছালে বকা খান। তিনি অপমানিত হন, তবু চাকুরি ছাড়েন না। অফিস যাওয়ার আগে বড় মেয়ে রোকেয়ার উদ্দেশ্যে শওকতের বাবাকে বলতে শোনা যায়,

> একটু দেরি হয়ে গেলেই বড় সাহেব ভীষণ বকাবকি করেন। (১৩: ৪২– ১৩: ৪৪ মিনিট)

উঁচু পদে আসীন ব্যক্তির ক্ষমতা আছে অন্যকে নিজের মতো করে পরিচালিত করার। তার অধীনে চাকুরিরত ব্যক্তিকে তিনি 'বকাবকি' করার এখতিয়ার রাখেন। চাকুরিদাতার এই বকাবকি অসম্মানজনক হলেও অধীনস্ত তা মুখ বুজে শুনতে বাধ্য। তা না হলে যেকোনো সময় চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতে পারে। এ ছাড়া শওকতের বাবার দুইটি অবিবাহিত মেয়ে আছে। তাঁর সঞ্চয়ও নেই। মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার জন্য যে আর্থিক সঙ্গতির প্রয়োজন তা গোছাতে তিনি অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

এদিকে শওকত শিল্পী ও একটু খেয়ালি প্রকৃতির। সংসারের দায়িত্ব সে নেয় না। শুধু ছবি আঁকে এবং প্রয়োজন হলে বোন রোকেয়ার কাছে গচ্ছিত সংসারের টাকা সে কেড়ে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। ছবির প্রদর্শনীতে যাওয়ার আগে রোকেয়ার শাড়ির আঁচলে বাঁধা তিন টাকা শওকত নিতে চাইলে সে ভাইকে বলে,

> ও তো রেশনের টাকা। সামনের সপ্তাহে রেশন আনতে হবে। (১৫: ৫৭ মিনিট)

এ পরিবারে সংসারের প্রতিটি খরচ হিসাব করে করা হয় বলে বোঝা যায়। টাকা না থাকলে টানাটানি হওয়ার চিন্তায় রোকেয়া ভাইকে বাধা দিতে চায়। এর উত্তরে শওকত মন্তব্য করে,

> সামনের সপ্তাহে! সে তো অনেক দেরি! তত দিনে তো আমরা মরেও যেতে পারি। কালকের কথা কালকে ভাবা যাবে। আজকের সমস্যা তো মিটুক। (১৬: ০১- ১৬: ০৯ মিনিট)

শওকতের বাবা ভবিষ্যতের চিন্তায় পরিশ্রম করছেন। আর শওকত বর্তমানে বিশ্বাসী। তার কাছে বড় সমস্যা হলো ছবি আঁকার জন্য টাকা না থাকা এবং ছবি দেখার জন্য টাকা না থাকা। সংসারের হিসাব নিয়ে সে চিন্তা করতে চায় না। এ ছাড়া বন্ধুদের সাথে আড্ডায় শওকত মধ্যমণি। তার কাছে কেউ সমস্যার সমাধান চাইলে সে পরামর্শ দেয় হাসিখুশি থাকার। বোনদের সাথে খুনসুটির সময়ও সে একই কথা বলে। দেখা যায়, জীবনের নানা বাস্তবতা শওকত তার আঁকা ছবির মাধ্যমে বোনদের সামনে তুলে ধরে ঠিকই, কিন্তু সব সমস্যার সমাধানে এসে বলে,

> ...তাই বলি, তাই বলি, সবকিছু ভাই ভুলে গিয়ে একটু হাসো । (৩৯: ১৪ মিনিট)

শওকতদের মতো পরিবারের কাছে বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা একধরনের কল্পনা বিলাসিতা। শওকত সে হিসেবে কল্পনা বিলাসী। জীবন তার কাছে সহজ ও সুন্দর। বাবার প্রতি সে নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতাই তাকে জীবনের বাস্তবতা থেকে দূরে রাখে। সে যখন বোনদের গান শোনাচ্ছে তখন বাবা বড় কর্তার বকা খাচ্ছেন। পরে শওকত যখন গ্রামে যায় ছবি আঁকতে তখন তার বাবার চাকুরি চলে যায়।

এদিকে শওকতের পাশের বাড়িতে থাকেন শিল্প সংগ্রাহক সুলতান। শওকতের পরিচয় জানতে পেয়ে তিনি মন্তব্য করেন,

> আপনি শিল্পী? ইটস্ আ গ্লোরি। আমিও শিল্পী। আপনি করেন সৃষ্টি, আমি সৃষ্টিকে জিইয়ে রাখি। (২৪: ০১ মিনিট)

শিল্পী পরিচয়কে গৌরবের বিষয় বলে বিশ্বাস করেন সুলতান। তিনি নতুন কিছু সৃষ্টি করেন না। কিন্তু অন্যের সৃষ্টিকে নিজের করে নেওয়ার মধ্যে মাহাত্ম্য খোঁজেন। শিল্পকে তিনি ধরে রেখেছেন বলে দাম্ভিকতাপূর্ণ দাবি করেন। নিজের বাড়ির সংগ্রহশালা সম্পর্কে তিনি শওকতকে বলেন,

> ন্যায়- অন্যায় সব পথ ধরেছি। চুরি করেছি। লোককে বশ করে চুরি করিয়েছি। সাদা চোখে লোক ঠকিয়েছি। একবার খুনও করেছি। আমার কাছে সত্যিকারের মানুষ হলো হাড়ের কাঠামো। আর মানুষের প্লাস্টার দিয়ে গড়া মূর্তি । (২৫: ১৯- ২৫: ৪৩ মিনিট)

সুলতানের টাকার যে অভাব নেই তা তার সংগ্রহশালা দেখলে বোঝা যায়। তিনি উচ্চবিত্তের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই টাকার জোরে তিনি অন্যায় পথ বেছে নিতে দ্বিধাবোধ করেন না। তার অপরাধকে কেউ চ্যালেঞ্জ করবে এমন সাহস কারও নেই বলে তিনি জানেন। সুলতান নিজেকে ছাড়া অন্যদের মানুষ মানতে রাজি নন। মানুষকে তিনি জড়বস্তু ভাবেন। কারণ জড়বস্তু তার কথার অবাধ্য হয় না। তিনি যেভাবে চাইবেন সেভাবে রাখতে পারেন। যেভাবে চান সেভাবে চালাতে পারেন। শওকত সুলতানের এই বিশ্বাসের কোনো প্রতিবাদ করে না। এমনকি সুলতান তার সংগ্রহশালার সবচেয়ে 'কম দামি সংগ্রহ' হিসেবে দাবি করেন মানুষ মরিয়মকে, তখনও শওকত নিশ্চুপ। সুলতান মরিয়মকে দেখিয়ে বলেন,

> ও আমার সব চাইতে কম দামের সংগ্রহ। সেও এই জাদুঘরের একজন। (২৫: ৫১- ২৫: ৫৫ মিনিট)

> ওকে আমি মানুষের হাত থেকে রক্ষা করেছি। ওকে আমি করেছি পাথরের মূর্তির মতো মৃত্যুহীন । (২৬: ২৭- ২৬: ৩৩ মিনিট)

দেখা যাচ্ছে, সুলতান নিজেকে ঈশ্বরতুল্য ভাবছেন। কারণ তিনি বিত্তশালী। তার ক্ষমতা আছে। তিনি তার অর্থ-বিত্তের জোরে মানুষকে কাছে টানা বা তাচ্ছিল্য ও অপমান করার সুযোগ পাচ্ছেন। শুধু শিল্পী হওয়ার কারণে শওকতকে তিনি সংগ্রহশালা দেখতে দেন। সুলতান নিজেই সৌন্দর্যের সংজ্ঞা তৈরি করেন, উপভোগ করেন। কাহিনির একপর্যায়ে যখন শওকত- মরিয়মের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন সুলতান শওকতের বাবাকে অপমান করেন। সুলতান তাকে বলেন,

> ছেলে কোন নর্দমায় যায়, কোনখানে থাকে তার কোনো খোঁজখবর রাখেন? (১: ০৩: ২৩ মিনিট)

তিনি এর প্রতিবাদ করতে পারেন না। বিষয়টি তিনি বুঝতে পারছেন না বলে মন্তব্য করলে শুনতে হয়,

> তা বুঝবেন কী করে। বোঝার মতো মগজ থাকলে গুণধর পুত্র না বানিয়ে বাড়িতে গাছ পুঁততেন। (১: ০৫: ২৮- ১: ০৫: ৩৩ মিনিট)

এ কথার পর শওকতের বাবা হাতজোড়া কচলে ঘর্মাক্ত নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। বাড়ি ফেরার পর সন্তানরা জানতে চাইলে তিনি 'কিছু হয়নি' এমনভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। শওকতের ছোট বোন বলে,

> লোকটা না আব্বাকে যা-তা বলে অপমান করেছে। আব্বা একটা কথাও বলেনি। চুপ করে দাঁড়িয়েছিল । (১: ০৬: ১০ মিনিট)

শওকতের বাবা অধীনস্ত কর্মচারী হিসেবে অভ্যস্ত। উঁচু তলার মানুষদের সাথে ঝামেলায় না জড়ানোকে তিনি সমীচীন বলে মনে করেন। এ জন্য সুলতানের কাছে অপমানিত হওয়া ঘটনা তিনি এড়িয়ে যেতে চান। ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

এদিকে বাবার সাথে সাথে বাড়ির দুই মেয়েও বিভিন্ন ঘটনার সাথে আপস করে। দুর্ঘটনায় বাবা মারা যাওয়ার পর তারা নিজেরা অভুক্ত থেকে শওকতের মুখে খাবার তুলে দেয়, ছেঁড়া শাড়ি পরে। কিন্তু শওকতের কাছে কোনো অভিযোগ বা অনুযোগ করে না। বড় বোন রোকেয়া মনে কষ্ট পুষে রাখে। কাউকে জানতে দেয় না। বরং ছোট বোনটি অভিযোগ করতে চাইলে রোকেয়া তার মুখ বন্ধ করার জন্য গালে চড় দেয়। সে সময় মরিয়ম এসে ছোট বোনকে কাঁদতে দেখলে রোকেয়া দাঁত ব্যথার অজুহাত দেয়। এরপর ছোট বোনকে বলে,

প্রয়োজনবোধে এক- আধটা মিথ্যা বলতে হয়। (১: ২২: ২৭ মিনিট)

এই মিথ্যা বলার মাধ্যমে আপস করে সংসারের চাকা সচল রাখে শওকতের পরিবার। নিজের মনের সাথেও আপস করে। শুধু আপস করেন না সুলতানের মতো মানুষ।

হিসাব ও আপসকামিতার সাথে যুঝতে যুঝতে শওকতদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মানসিক সংকট প্রকাশ পায়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দোদুল্যমান সিদ্ধান্ত তাদের জীবনকে আরও জটিল করে তোলে।

দোদুল্যমান সত্তা ও মানসিক সংকট

বাবার মৃত্যুর পর শওকত ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে চাকরি খুঁজতে শুরু করে। পরিস্থিতির চাপে সে বাধ্য হয় ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে। সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য সে উপার্জনের চেষ্টা করে। কিন্তু কোথাও চাকরি পায় না। আবার বড় বোন রোকেয়ার বিয়ের ব্যবস্থাও করতে পারে না। এবার সে বাস্তবতা টের পায়। তাই পরিচিত চায়ের আড্ডাখানায় বসে সানগ্লাস পরা এক যুবক যখন শিল্পীদের জীবনকে বিলাসী বলে সমালোচনা করে সে সময় শওকত চশমাটি খুলে নিয়ে বলে ওঠে,

দুনিয়াটাকে খোলা চোখে দেখতে চেষ্টা করুন। অনেক কিছু বুঝবেন। (১: ৩৬: ০৮ মিনিট)

শওকতের চোখেও এত দিন রঙিন চশমা ছিল। শিল্পীর চোখ দিয়ে সে এতদিন কাগজে জীবনের বাস্তবতা তুলে ধরেছে। কিন্তু মানুষ হিসেবে সে উপলব্ধি করে জীবনের বাস্তবতা ভিন্ন। ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারে চায়ের আড্ডাখানায় খাওয়ার বিল জমা হচ্ছে। বাড়িতে রেশন ফুরিয়ে গেছে। এর মধ্যে সুলতানের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মরিয়ম বিয়ের কথা বলে। পালিয়ে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু শওকত বলে,

দু–দুটো বোন রয়েছে আমার। এদের ফেলে যাব কেমন করে? (১: ২৪: ৩৮ মিনিট)

দায়িত্ব ও পিছুটান শওকতকে সিদ্ধান্ত নিতে দেয় না। বোনদের ফেলে যাওয়ার কথা সে ভাবতে পারে না। আবার মরিয়মকেও দূরে ঠেলে দিতে চায় না। গভীর রাতে ক্ষুধার তাড়নায় ছোট বোনটি না ঘুমিয়ে এপাশ-ওপাশ করে। ভাই হিসেবে এখানেও সে কিছু করতে পারে না। এদিকে শওকতের সাথে মেলামেশার কারণে সুলতান মরিয়মকে মারধর করে। শওকত মারধরের সেই শব্দ শুনেও বাধা দিতে যায় না। মরিয়মকে ভালোবাসার দাবি করলেও ওই সংগ্রহশালা থেকে মরিয়মকে মুক্ত করার সাহস সে পায় না। কিন্তু সহ্যও করতে পারে না। মারধরের শব্দ শুনে সে কান চেপে চিৎকার করে 'না, না' বলে। অবশেষে মরিয়ম একবার পালিয়ে এলে মন্তব্য করে,

কী ছেলেমানুষী করছ? চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি । (১: ৪৭: ৩৩ মিনিট)

নিজের সীমাবদ্ধতার কারণে সুলতানের সংগ্রহশালায় সে মরিয়মকে পৌঁছে দিতে চায়। এক পর্যায়ে মরিয়ম তাকে পালিয়ে যেতে জোর করলে সে 'তা হয় না' বলে জানিয়ে দেয়। অথচ বোনদের সাথে রাগারাগি করে বলে,

> জীবনটা অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার। আর পারি না। তোরা মরলে আমি বাঁচি । (১: ৫৪: ৩৯ মিনিট)

পরিবারের জন্য কিছু না করতে পারার হতাশা তাকে পর্যদুস্ত করে। সেই হতাশা সে বোনদের উপর উগরে দেয়। স্বার্থপরের মতো সে একসময় নিজের কথা ভাবতে চায়। নিজের মুক্তির উপায় খোঁজে। কোনো এক রাতে মরিয়মকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে বোনদের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখে,

> পৃথিবীতে কেউ কারও নয়। আমি আমার পথে চললাম। তোমরা তোমাদের পথ বেছে নিও। (২: ০৭: ৫৭ মিনিট)

শওকত তার মূল্যবোধ ও দায়িত্বের কারণে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। একজন ভাই বা প্রেমিকের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে অপারগ শওকত তাই নিজের সিদ্ধান্তের সাপেক্ষে যুক্তি তৈরি করে নেয়। তারপরও সে তার যুক্তির কাছে হেরে যায়। বোনদের আত্মহত্যার ঘটনা শওকতকে পীড়িত করে। কারণ সে নিজে বোনদের প্ররোচিত করেছিল আত্মহত্যার মতো সিদ্ধান্ত নিতে। পরে বিবেকের দংশনে শওকত তার ছবি বন্ধক রাখার টাকায় কেনা বিষ পান করে নিজের মুক্তি নিশ্চিত করে।

দোদুল্যমান সত্তা ও মানসিক সংকট অনেক সময় জীবনযুদ্ধে হেরে যেতে বাধ্য করে। একজন শিল্পী স্রষ্টা হলেও জীবনের নানা সমস্যাসংকুল সময়ে সে নিজের তৈরি যুক্তিতে টিকে থাকতে পারে না। এভাবে প্রতিটি চরিত্র হয়তো কোনো না কোনো ঘটনায় নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নেয় বা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। বিষয়টি বুঝতে চরিত্রগুলোর নীতি ও আদর্শ বোঝা তাই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

চরিত্রগুলোর নীতি ও আর্দশ

শওকত একজন শিল্পী। সৃষ্টির মধ্যে সে আনন্দ খুঁজে পায়। খেয়ালিপনা তার স্বভাবসিদ্ধ। তাই বাবার মৃত্যুর পর শওকত জীবনযুদ্ধের মুখোমুখি হলে মনের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। চাকুরি খুঁজতে থাকা শওকতকে আগের মতো দেখতে না পেয়ে মরিয়ম বলে,

> সারাদিন কোথায় থাকো? (১: ৪৭: ৪১ মিনিট)

শওকত বলে ওঠে,

> নরকে । (১: ৪৭: ৪২ মিনিট)

বাস্তবতা শওকতের মনকে পোড়ায়। ফলে তার অবস্থা নরকের শাস্তি ভোগ করার মতো কষ্টদায়ক। বাবার মতো অভিভাবক শওকত হয়ে উঠতে পারে না। বোনেরা অভুক্ত থাকছে, পোশাক ছেঁড়া তা লক্ষ করার মতো মন ও মনোযোগ তার মধ্যে দেখা যায় না। পারিবারিক মূল্যবোধ অনুযায়ী বড় ভাইয়ের আগে বোনদের বিয়ে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত সে নেয় না। বরং নিজের বিয়ের কথা আগে চিন্তা করে। শওকত যখন বোনদেরকে জানায় সে মরিয়মকে বিয়ে করতে চায় তখন রোকেয়া আস্তে করে বলে ওঠে,

ভালো-ই তো । (১: ২৭: ৩৭ মিনিট)

বোনের কথা শুনে শওকত থমকে যায়। কারণ সে বুঝতে পারে রোকেয়াকে আগে পাত্রস্থ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে কষ্ট করে পাত্র খোঁজার চেষ্টা করেনি। এরপর শওকত তার বন্ধু খালেক, যে কি না একাধিক মেয়ের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে এবং লোভী-তাকে প্রস্তাব দেয় রোকেয়াকে বিয়ে করার জন্য। অর্থাৎ কোনোরকমে রোকেয়াকে পাত্রস্থ করার বিষয়টি সে সমাধান করতে চায়।

এদিকে শওকতের পরিবার দারিদ্রের মুখে পড়লেও শওকতকে কারও ওপর নির্ভরশীল হতে দেখা যায় না। টাকার প্রয়োজন হলে সে নিজের আঁকা ছবি বন্ধক রাখে। চায়ের আড্ডায় ধারে খায়। আবার নিজের পুরানো জামা বিক্রি করে ছবি আঁকার সরঞ্জাম কেনে। চাকুরি না পেয়ে অন্য কিছু করার চেষ্টা তাকে করতে দেখা যায় না। পরিবারে অভাব থাকার পরও সে পরিপাটি হয়ে চলে। বোনদের পোশাক ছিঁড়লেও তার পোশাক ভালো থাকে। ঘরে চাল শেষ হয়ে এলেও, সিগারেট ঠিক থাকে।

শওকতের চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, নারীকে অবমূল্যায়নের মনোভাব। শিল্পী শওকত তার পুরুষালী মনোভাব থেকে বের হতে পারে না। তাই বন্ধুদের কাছে সে মন্তব্য করে, নারীর সাথে জড়ানো অর্থ 'বাজে কাজ'। বন্ধু মাহমুদকে সে যুক্তি দেয় এই বলে যে, তাতে নাকি 'মনের উদারতা নষ্ট হয়'। অর্থাৎ পুরুষের সৃষ্টিশীলতায় বাধা হিসেবে দাঁড়ায় নারী। এর মানে, পুরুষ এতটাই দুর্বল যে তার প্রতিভা, সচ্ছিদা সব নারীর কারণে ভেস্তে যায়। তবে কাহিনির একপর্যায়ে শওকত মরিয়মের প্রেমে পড়লে মাহমুদকে বলে,

একমাত্র প্রেমই মানুষের জীবনে পরিপূর্ণতা আনে। তাকে দেয় সবচেয়ে বড় আনন্দ। (১: ০৮: ৫৫ মিনিট)

এ ছাড়া নারীদের সহজলভ্য ভাবার প্রবণতা পুরুষ চরিত্রগুলোর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। চায়ের আড্ডায় শওকতের বন্ধু খালেক সিগারেট খেতে খেতে বলে ওঠে,

এ বয়সে কত মেয়েকে মোষের মতো চড়িয়ে বেড়ালাম। (২০: ১০ মিনিট)

ওদের জন্য যত বেশি কাঁদবে, ওরা তত বেশি কাঁদিয়ে ছাড়বে। (২০: ৩৬ মিনিট)

এ কথা শুনে শওকত ও মাহমুদ হেসে ওঠে। অথচ শওকতের নিজের দুইটি বোন আছে। সে প্রতিবাদ না করে মজা নেয়। চলচ্চিত্রের গল্পে এই তিনজন পুরুষকে চায়ের আড্ডায় সব সময় নারীকেন্দ্রিক গল্প করতে দেখা গেছে। নারীকে নিয়ে উপহাস করা, কৌতুক করা একটি সহজাত বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে।

এ ছাড়া শিক্ষিত এই পুরুষেরা নারীকে দেখতে চায় কখনো 'দূর্বোধ্য কবিতা'র মতো, কখনো চায় ভালোবাসার মানুষটি নাচে, গানে পারদর্শী হবে। শওকতকে মরিয়ম যখন জানায় সে নাচতে, গাইতে পারে না তখন সে বলে,

কোনটাই জানো না? ডোবালে। বড় হতাশ করলে, মেরি। (১: ০১: ০৯ মিনিট)।

বড় আশা ছিল, আমি যাকে ভালোবাসব সে নাচতে পারবে, গাইতে পারবে। তার গানের সুরে সুরে মন আমার বলাকার মতো উড়ে যাবে দূরে। (১: ০১: ১৯- ১: ০২: ২৯ মিনিট)

শওকতের মতো একজন শিক্ষিত ও শিল্পী মানুষও নারীর মধ্যে নিজের সমক্ষণ গুণ খোঁজে না। তারচেয়ে প্রতিভাধর কাউকে কল্পনা করে না।

অন্যদিকে সুলতানের মধ্যে আছে ধূর্ততা, স্বার্থপরতা ও ক্ষমতার মোহ। তাঁর মধ্যে নীতির কোনো বালাই নেই। নিজেই অকপটে তা স্বীকার করে নেন। শিল্প সংগ্রাহক হিসেবে তিনি চুরি, খুন- অনেক কিছুই করেছেন। অর্থ ও মর্যাদার বলে তিনি অন্যদের তুচ্ছজ্ঞান করেন। মানুষকে মিউজিয়ামের সংগ্রহ হিসেবে আটকে রাখেন। মূর্তির মতো দাঁড় করিয়ে উপভোগ করেন। তার 'সংগ্রহ' মরিয়মকে তিনি বলেন,

> আহ! ডোন্ট মুভ! নড়বে না। চোখের পাতাও ফেলবে না। লেট মি সি ইট। আমাকে দেখতে দাও। (১: ৩১: ৪৬- ১: ৩২: ০২ মিনিট)

> সুন্দর চিরকাল স্থির হয়ে থাকবে।... মানুষের হাতে সে ধরা দেবে না।... তুমি সেই সুন্দর। (১: ৩৩: ১১- ১: ৩৩: ৩৬ মিনিট)

সুলতান আদেশ দিতে অভ্যস্ত। তিনি মনে করেন তার আদেশ এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য কারো নেই। কয়েকবার তিনি শওকতকে অপমান করেন, শওকতের বাবাকেও অপমান করেন। মরিয়মকে পেটান, মরিয়মকে ছুরি দেখিয়ে বোঝান তিনি প্রয়োজন হলে শওকতকে হত্যা করবেন। তার নীতি হলো, অর্থ ও ক্ষমতার মাধ্যমে মানুষকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা। তাদেরকে নিজের আজ্ঞাবহ বানানো। এজন্য তিনি কোনো অন্যায় করতে দ্বিধা করেন না।

গল্পের নারী চরিত্রগুলো সহজ- সরল। রোকেয়া আর ছোট বোনের হাতে সংসার গুছিয়ে রাখার দায়িত্ব। বাড়ির বড় বোন রোকেয়ার চরিত্রটি সাংসারিক। পরিস্থিতি বুঝে সে কাজ করে। নানা বিষয়ে জেদ করতে থাকা কিশোরী বোনটিকেও সে সামলে নেয় সময়ে সময়ে। মায়ের মতো আগলে রাখে তাকে। অভাবের দিনেও মুখ বুজে রোকেয়া সংসার সামলায়। নিজের চাওয়া-পাওয়া রোকেয়াকে কখনো প্রকাশ করতে দেখা যায় না। তবে ছোট বোনটি মাঝে মাঝে তার ইচ্ছা- অনিচ্ছা, অভাব- অভিযোগ তুলে ধরে। মরিয়মকে সে বলে,

> ভাইয়া না ভীষণ স্বার্থপর। নিজে ভালো রুমটা বেছে নিয়েছে। (৩৩: ১০ মিনিট)

শওকতের কাছে সে ছবি আঁকা শিখতে চায়। ঘরে চাল কম থাকলে ছোট বোনটি রোকেয়াকে জানায়, আধপেটা হয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বড় বোনের বকা খেয়ে একপর্যায়ে বাবার উপস্থিতিতে মুখ ফসকে বলে ফেলে, রোকেয়া যেন তাকে বেশি উপদেশ না দেয়। কারণ রোকেয়া 'অবিবাহিত', 'বুড়ি ধিঙ্গি মেয়ে'। পরিবেশ থেকে সে শিখেছে বেশি বয়সী মেয়েদের সময়মতো বিয়ে না হওয়াটা অপমানজনক। এই ধরনের মেয়েরা উচিত কথা বলার অধিকার রাখে না। তবে ছোট বোনটি রোকেয়াকে ভালোবাসে। অবসরে দুই বোন মিলে গল্প করে, চুলে বিণী বাধে ও সাংসারিক কাজ করে।

নারীরা বাড়ির পুরুষদের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এমনকি তাদের জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্তও পুরুষ নেয়। এক অর্থে পুরুষ তাদের ভাগ্য নিয়ন্তা। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকা শওকত নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বোনদেরকে বকাবকি করে। তারা শওকতের বোঝা হয়ে উঠেছে সেই ইঙ্গিত করে। বোনদের সামনেই তাদের মৃত্যু কামনা করে। একসময় সে মরিয়মকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে

দুই বোনের লাশের ছবি এঁকে আর চিঠির মাধ্যমে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয়। বাড়ির পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল দুই বোন উপায় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে।

প্রতিবেশী মরিয়মও পুরুষের অধীন। বেশভূষায় সে আধুনিক। চিত্রশিল্পের প্রতি তার আগ্রহ আছে। কিন্তু এটি মনে রাখতে হবে, মরিয়মের নিজস্ব উপার্জন নেই। তার জীবন সুলতানের দয়ায় কেটে চলে যাচ্ছে। এই সুলতানের চোখকে ফাঁকি দিয়ে শওকতের সাথে শহর ও গ্রামের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেও সুলতানের সংগ্রহশালা থেকে সাহস করে একা বেরিয়ে আসার কথা মরিয়ম ভাবতে পারে না। কাহিনির একদম শুরুতে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় শওকতদের বর্তমান বাড়িতে আগে যারা থাকতেন তাদের মৃত্যুর সাথে মরিয়মের একটা সম্পর্ক আছে। কাহিনির এক পর্যায়ে শওকতের সাথে প্রেম হলে সে সুলতানের সংগ্রহশালা থেকে মুক্তিলাভের বিষয়ে আশাবাদী হয়ে ওঠে। লুকিয়ে শওকতের বাড়িতে এসে শওকতকে বলে,

> জানতে পারলে আমাকে মারবে। আমাকে নিয়ে চল এখান থেকে। (১: ২৪: ১১- ১: ২৪: ২৬ মিনিট)

শওকতের মৃত্যুর সময় মরিয়ম তার কাছে যেতে চাইলে সুলতান তাকে বাধা দেয়। ওই বাধা পেরিয়ে সে বেরিয়ে যাওয়ার মতো সাহস পায় না। ওই সময় মরিয়ম সংগ্রহশালার কিছু মূর্তি ভেঙে ফেলে, কিছু ভাঙার চেষ্টা করে, যাতে সুলতান তাকে শওকতের কাছে যেতে দেয়। কিন্তু সুলতানকে তাঁর সিদ্ধান্তে অটল দেখে সে কেঁদে কেঁদে বলতে থাকে 'আমাকে যেতে দাও'। এর বেশি কিছু করার ক্ষমতা তার ছিল না। শওকতের মৃত্যুর পর মরিয়ম কাঁদতে কাঁদতে মনে মনে বলে,

> আমাকে এই জাদুঘরে তিল তিল করে মরতে হবে। আমাকে সেখান থেকে কেউ বের করে নিয়ে যেতে পারবে না। (২: ১৯: ২৩- ২: ১৯: ৩২ মিনিট)

মরিয়মকে উপস্থাপন করা হয়েছে এমনভাবে যেখানে মনে হতে পারে পুরুষের সর্বনাশের কারণ একজন নারী। নিজের মুক্তির জন্য মরিয়ম বারবার পুরুষদের ব্যবহার করেছে।

মধ্যবিত্তীয় রোমান্টিসিজম থেকে শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল শওকত। তার পরিবার উচ্চমধ্যবিত্ত থেকে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে পরিণত হলেও শওকত তার শিল্পী সত্তাকে বিসর্জন দেয় না। আবার অর্থাভাবে অসৎ পথেও পা বাড়ায় না। অথচ বিত্তশালী সুলতান অর্থ ও সম্পদের ক্ষমতায় একের পর এক অন্যায় করেই চলেন। সেই সঙ্গে এটিও দেখা যায়, পুরুষ যতই শিক্ষিত হোক নারীকে মানুষ ভাবার প্রবণতা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে না। আর নারীরাও শিক্ষিত হয়েও পুরুষের অধীনস্ত থাকার অভ্যস্ততা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।

এদিকে বিভিন্ন ঘটনায় চরিত্রগুলোর মধ্যকার সামাজিক অবস্থানগত দ্বন্দ্ব প্রকটভাবে দেখা যায়। এই দ্বন্দ্ব থেকে বোঝা যায়, সমাজে কোন পক্ষ ক্ষমতাবান হিসেবে অধিষ্ঠিত, কোন পক্ষ সুবিধাভোগী।

সামাজিক অবস্থানগত দ্বন্দ্ব

এ চলচ্চিত্রের কাহিনিতে সমাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে নানারকম দ্বন্দ্ব দেখা যায়। সুলতান উঁচু তলার মানুষ আর শওকতের পরিবার সে তুলনায় একদম সাধারণ। শওকতের বাবা একজন কর্মচারী। বড় সাহেবের অধীনে কাজ করে অভ্যস্ত। তার চেয়ে অর্থবিত্তে শক্তিশালী মানুষের সাথে তিনি দ্বন্দ্বে জড়াতে চান না। নিজের

অভিজ্ঞতা থেকে জানেন সমাজে টিকে থাকতে হলে উচ্চবিত্তদের বিরুদ্ধে কিছু বললে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। এ জন্য অফিসের বড় কর্তার ধমক খেলেও চাকুরি হারানোর ভয়ে তিনি নীরব থাকেন। জোর করে যখন তাকে অবসরে পাঠানো হয় তখন অনুনয়-বিনয় করেন,

> এখন চাকরিটা গেলে না খেয়ে উপোস করে মরতে হবে, স্যার।... একটু দয়া করুন, স্যার। (৫৯: ১৬ মিনিট)

বড় কর্তাদের কাছে এমন অনুনয় একধরনের 'জ্বালাতন'। যত দিন প্রয়োজন ছিল কর্মচারীকে রেখেছিলেন। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই অবসরে পাঠিয়ে দেন। তাদের কাছে প্রতিষ্ঠানের লাভ মূল কথা। যারা আর্থিকভাবে লাভবান হতে সাহায্য করেন তারাই প্রতিষ্ঠানে প্রাধান্য পান।

এদিকে মরিয়মের সাথে শওকতের প্রেম হওয়ার পর শওকতকে সুলতান 'ছ্যাবলা', 'নদর্মায় থাকে' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষায়িত করতে থাকেন। প্রথমে শওকতের বাবাকে অপমান করেন। এরপর একপর্যায়ে সুলতান নিজের বাড়িতে ডেকে এনে শওকতকে অপমান করেন। সুলতানের টাকা আছে, যার জোরে তিনি অন্যকে তাচ্ছিল্য করেন। শওকতের বাবা অপমানিত হন, ব্যথিত হন, কিন্তু প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন না। সন্তানদের বলেন,

> লোকটার সাথে আমার এমন কী সম্পর্ক যে আমাকে অপমান করবে? (১: ০৬: ১৭ মিনিট)

শওকত তার শিল্পের মাধ্যমে জীবনের বাস্তবতা তুলে ধরে। তার ঘরের দেয়ালে পেশীবহুল কৃষকের ছবি, মুটে বয়ে আনা শ্রমিকের ছবি দেখা যায়। বোনদের গানের অর্থ বোঝায় আঁকা ছবির মাধ্যমে। সেখানে শওকত বলে,

> ...দুনিয়া ঘোরে টাকার চাকায়/ সাহেব যারা গাড়ি হাঁকায়/ সবাই তাদের সালাম জানায়/ ... আসল কথা হলো কাজের বেলায় তুমি ভালো/ কাজ ফুরালে তুমি কালো। (৩০: ৫০- ৩১: ১৭ মিনিট)

এখান থেকে সমাজে অর্থ ও সম্পদের প্রভাব এবং মানুষের অবস্থান সম্পর্কে শওকতের উপলব্ধি বোঝা যায়। সমাজে যাদের টাকা আছে তারাই সম্মানিত। যারা কাজ পারে তারা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কাজ শেষ হলেই সেসব মানুষ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। যেমনটি হয়েছিলেন শওকতের বাবা। এ ছাড়া শওকত জীবনের বিকাশকে অনুভব করার জন্য গ্রামীণ জীবন ও পরিবেশকে প্রাধান্য দেয়। তাকে শিল্পে রূপ দিতে প্রায় সময় সে গ্রামে চলে যায়। যদিও গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ শওকতের শিল্পের বিষয়, কিন্তু প্রয়োজনে সে ওই খেটে খাওয়া মানুষের কাতারে নামতে পারে না।

যেমন গল্পে দেখা যায়, বাবা মারা যাওয়ার পর শওকত চাকুরি খোঁজে। কিন্তু কেউ তাকে চাকুরি দেয় না। সংসারে অভাব থাকার পরও শওকত ইট ভাঙে না, কুলিগিরি করে না; অর্থাৎ, জীবিকা নির্বাহের জন্য শ্রমিকদের মতো কাজ করার আগ্রহ বা চেষ্টা শওকতের মধ্যে দেখা যায় না। এরচেয়ে ছবি বন্ধক রাখা, নিজের পুরোনো কাপড় বিক্রি করে ছবির আঁকার সরঞ্জাম কেনায় সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

আবার গল্পের শুরুতে শিল্পের সমঝদার হিসেবে ব্যবসায়ী সুলতানকে শওকতের যেমন ভালো লেগেছিল, তেমনি শুধু শিল্পী বলে শওকতকে সম্মান দেখিয়েছেন সুলতান। পরিচয়ের প্রথম দিনই সুলতান শওকতের সামনে বলে ওঠেন,

> আমার কাছে সত্যিকারের মানুষ হলো হাড়ের কাঠামো। আর মানুষের প্লাস্টার দিয়ে গড়া মূর্তি। (২৫: ৩৫ মিনিট)

রক্ত- মাংসের কাঠামো তিনি স্বীকার করতে চান না। বিশ্বাস করেন, মানুষ হলো জড়বস্তু। তার নিজস্ব কণ্ঠস্বর নেই, অনুভূতি নেই। মালিক যা বলবেন মূর্তির মতো তাই তাকে করতে হবে। সুলতান তাঁর সংগ্রহশালার সবচেয়ে 'কম দামি' সংগ্রহ হিসেবে দাবি করেন 'মানুষ মরিয়ম'কে। একজন মানুষকে ছোটবেলা থেকে বন্দী করে রেখেও তিনি আইনের আওতামুক্ত থেকে গেছেন। সুলতানের এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শওকত কোনো মন্তব্য করে না। মৌন থাকার মাধ্যমে সে সুলতানকে যেন সমর্থনই করে। পরে মরিয়মের সাথে নানা আলাপচারিতায় শওকতকে কখনো এ বিষয়ে জিজ্ঞেসা করতে দেখা যায় না। সুলতানের সংগ্রহশালায় মরিয়মের থাকা নিয়ে সে কখনো আপত্তিও তোলে না।

তবে শিল্পী শওকতকে পছন্দ করার পরও শওকতের মতো সাধারণ পরিবারের সাথে মরিয়মের মেলামেশা মেনে নিতে পারেন না ধনাঢ্য ব্যবসায়ী সুলতান। শওকতের ছোট বোনকে মরিয়মের সাথে গল্প করতে দেখে সুলতান বলেন,

> মরিয়ম, এ তুমি কাদের সঙ্গে মিশছ? কতগুলো সাধারণ দুপেয়ে জীব। আমি এ হতে দেব না, মরিয়ম। (৩৬: ১৭- ৩৬: ২২ মিনিট)

মাত্র ৫০ টাকা দিয়ে সুলতান একসময় মরিয়মকে কিনেছিলেন। তাই মরিয়ম তার সম্পত্তি। মরিয়মের জীবন তিনি শতভাগ নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রাখেন বলে বিশ্বাস করেন। এখানে অন্য কারও প্রবেশ তিনি বরদাশত করেন না। ফলে মরিয়ম কীভাবে তার সামনে থাকবে, কোথায় যাবে, কার সাথে মিশবে সবকিছু সুলতানের অনুমতিতে হতে হবে। সারা জীবন একা থাকার শঙ্কা নিয়ে মরিয়ম হাহাকার করে উঠলে সুলতান বলে উঠেন,

> একা? কে একা? একা এই মানুষগুলো। পঁচা মাংসের জীবগুলো।... তুমি- আমি একা নই। (৩৬: ২৭- ৩৬: ৩৯ মিনিট)

তিনি মরিয়মের সৌন্দর্যকে স্থায়ী করে রাখার চেষ্টা করেন তাকে বন্দী করে রাখার মাধ্যমে। মরিয়মকে তিনি বারবার বোঝান, যদি মরিয়ম কাউকে আপন করে নেয় তবে সে সাধারণ মানুষের মতোই 'কদর্য' হয়ে পড়বে। কারণ সুলতানের মতে সৃষ্টির সৌন্দর্য তার স্থিরতায়। মহৎ হওয়ার বাসনায় তিনি মরিয়মকে নিয়ন্ত্রিত করতে চান। এ জন্য তিনি মেয়েটিকে বলেন,

> মানুষের হাত তোমাকে নোংরা করে দেবে, ভেঙে ফেলবে, মরিয়ম।... কোটি কোটি মানুষ ঘাসের মতো গজায়। ঘাসের মতো ওগুলো পায়ের নিচে থাকার যোগ্য। সাধারণ মানুষের মতো বিয়ে করে, একগাদা বাচ্চা দেওয়ার মধ্যে কী আছে? (৩৬: ৫০- ৩৭: ০৮ মিনিট)

ঠিক এ কারণেই মরিয়মের সাথে শওকতের প্রেম হওয়ার পর শওকতের শিল্পীসত্তা সুলতানের কাছে গৌণ হয়ে পড়ে। শওকত তার চোখে তখন সাধারণ একজন মানুষ। তার আচরণ সুলতানের ভাষায় 'ছ্যাবলামি' হয়ে ওঠে। তিনি বলেন,

> শিল্পী সেজে আমার বাড়িতে ঢুকেছিলেন। এখন চোর সেজে আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদে হাত দিয়েছেন। (১: ৪৩: ৩০- ১: ৪৩: ৩৬ মিনিট)

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যে মানুষ প্রতিবাদ করে তার উদাহরণ হয়ে ওঠে শওকত। কাহিনির একটি অংশে চায়ের আড্ডাখানায় রোদচশমা পরিহিত এক যুবক শিল্পীদের জীবন নিয়ে সমালোচনায় মশগুল। সেখানে উপস্থিত শওকতের সেসব কথা অসহ্য ঠেকলে সে যুবকটির চশমা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে। সাথে কিছু উপদেশও দিয়ে যায়।

শওকতের মতো একজন সাধারণ যুবকের সাথে মরিয়মের প্রেম মেনে নিতে পারেন না সুলতান। তাদের প্রেমকে তিনি 'নোংরামি' বলে মন্তব্য করেন। ঘটনাক্রমে মরিয়মের বিষয়ে কথা বলতে শওকতকে বাড়িতে ডেকে পাঠান সুলতান। পারিপার্শ্বিকর্তার কারণে বিধ্বস্ত ও বিরক্ত শওকত সুলতানের সাথে তর্ক এড়িয়ে চলতে চায়। সুলতানের আক্রমণাত্মক কথাকে সে গুরুত্ব দিতে চায় না। তার কাছে এগুলো সময় নষ্ট বলে মনে হয়। সুলতানকে সে বলে,

> আমার হেঁয়ালি শোনবার সময় নেই। চললাম। (১: ৪৩: ৪৩ মিনিট)

তর্কের একপর্যায়ে সুলতানকে সে ধমকও দেয়। একসময় সুলতান নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারালেও শওকত হারায় না। শওকতকে তিনি মরিয়মকে নিজের সংগ্রহে রাখার যুক্তি হিসেবে জানান তাঁর কাছে সব সৌন্দর্য পাথর। তাই মরিয়মের দিকে শওকত হাত বাড়াতে পারবে না। এরপর তিনি শওকতের গলা চেপে ধরলে শওকত তাকে ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দেয়। সুলতান ছুরি বের করে হত্যার হুমকি দিলে সে বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

সাধারণত ক্ষমতাবানের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো শক্তি অর্জন করা অন্যান্য শ্রেণির জন্য কঠিন হয়ে ওঠে। তবে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে প্রতিবাদ করে, ক্ষেত্র বিশেষে বিদ্রোহও করে। তবে সব সময় এর ফলাফল অনুকূলে যায় এমন নয়। অনেক সময় অর্থ ও ক্ষমতার কাছে হেরে যায় মানুষের স্বপ্ন ও সাধ।

৩.৪.২ *আনোয়ারা* (১৯৬৭)

বাঙালি ঔপন্যাসিক মোহাম্মদ নজিবর রহমান রচিত উপন্যাস *আনোয়ারা* অবলম্বনে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন জহির রায়হান। *আনোয়ারা* চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লিখেছিলেন আমজাদ হোসেন। প্রযোজনা করেছেন ইফতেখারুল আলম। চলচ্চিত্রটিতে প্রধান চরিত্রগুলোতে অভিনয় করেন রাজ্জাক, সূচন্দা, বেবী জামান, রানী সরকার, আমজাদ হোসেন প্রমুখ।

কাহিনি সংক্ষেপ

মধুপুর গ্রামের বাসিন্দা তরুণী আনোয়ারাকে ঘিরে গল্প আবর্তিত হয়। তার বাবা খোরশেদ আলী ভূঞা একজন পাট বিক্রেতা ও গ্রামের সম্মানিত মানুষ। এই পরিবারের আরও আছেন খোরশেদের মা, খোরশেদের দ্বিতীয় স্ত্রী, তাদের পুত্র সন্তান ও দুইজন গৃহকর্মী। সৎ মা গোলাপজান আনোয়াকে দিয়ে ঘরের সব কাজ করান এবং সারাদিন গালাগালি করেন। দাদি এর প্রতিবাদ করতে গেলেই গোলাপজানের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগে যায়। খোরশেদ তাঁর স্ত্রীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেন না। এদিকে তাঁর সব টাকা স্ত্রী গোলাপজানের কাছে থাকে। অনেক সময় খোরশেদের পকেট থেকে টাকাপয়সা গোলাপজান ছিনিয়েও নিয়ে যান।

কাহিনির অন্যতম প্রধান চরিত্র এবং বেলগাঁও জুট মিল কোম্পানির কর্মকর্তা নুরুল এসলাম একদিন মধুপুরে আনোয়ারাদের বাড়িতে আসে পাট কিনতে। ঘটনাচক্রে সে সময় অসুস্থ আনোয়ার চিকিৎসা করে নুরুল। ওই সময় আনোয়াকে দেখে ভালো লেগে যায় তার। এদিকে আনোয়ারা তাকে আগেই নদী ঘাটে কুরআন পাঠ করতে দেখেছিল। সেই স্মৃতি ও চিকিৎসায় মুগ্ধ আনোয়ারা এরপর নুরুলকে ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতে পারে না।

গোলাপজান নিজের ভাইয়ের ছেলে সাথে আনোয়ারা বিয়ে দেওয়ার জন্য যোগসাজশ করেন। যেহেতু একমাত্র সন্তান হিসেবে সব সম্পত্তি আনোয়ারা পাবে, তাই গোলাপজানের ভাই বুদ্ধি দেন তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলতে। বিয়ের দিন খোরশেদের হালের বলদ ও গোয়ালঘর পুড়ে যাওয়ায় বিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। পরে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে নুরুলের সঙ্গে আনোয়ারার বিয়ে হয়।

এদিকে রতনদিয়া গ্রামের নুরুলের পরিবারও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবার। তার সংসারেও সৎ মা, এক বিবাহিত বোন ও গৃহকর্মী আছে। এই মা চেয়েছিলেন মেয়ে জামাতার বোনের সঙ্গে নুরুলের বিয়ে দিতে। কিন্তু নুরুল আনোয়ারাকে বিয়ে করে আনায় তিনি ক্ষুব্ধ হন। এরপর আনোয়ারাকে বিভিন্নভাবে মানসিক নির্যাতন করতে থাকেন। একসময় নুরুল এর প্রতিবাদ করতে গেলে তিনি নিজের স্বামীর সম্পত্তিটুকুর ভাগ নিয়ে আলাদা হয়ে যান।

এদিকে কোম্পানির একজন সৎ কর্মচারী হওয়ায় কোম্পানি নুরুলকে পুরস্কৃত করে। তার সহকারীরা তার নজর এড়িয়ে টাকা মেরে দিতে পারে না। ফলে তারা নুরুলের বিরুদ্ধে সব সময় ষড়যন্ত্র করতে থাকে। একপর্যায়ে নুরুল যক্ষ্মা রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পরে। আনোয়ারা দিনরাত তার সেবা করে। যেকোনো মূল্যে সে স্বামীকে সুস্থ করে তুলতে চায়। নুরুলের সৎ মা তাদের অভিশাপ দিতে থাকে। এই সুযোগে নুরুলের কর্মচারীরা অন্য এক নারীর সাহায্যে রাতের আঁধারে আনোয়ারাকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সে সময় হঠাৎ আনোয়ারার ছোটবেলার বান্ধবী হামিদার স্বামী উপস্থিত হলে অপহরণের চেষ্টা ভেস্তে যায়। এ ঘটনায় সৎ মা আনোয়ারা ও নুরুলকে কথা শোনায়। নুরুল সব জেনেবুঝেও ভয় ও লজ্জায় স্ত্রীর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়।

একপর্যায়ে বড় অংকের টাকা চুরি করে দুই সহকারী নুরুলকে ফাঁসিয়ে দেয়। হামিদার উকিল স্বামীর প্রচেষ্টায় নুরুল পরে জেল থেকে মুক্তি পায়। এরপর কোম্পানি তাকে বড় অংকের ক্ষতিপূরণ দেয়। ওই টাকা নিয়ে নুরুল স্ত্রীসহ শ্বশুরবাড়িতে আসে। এত টাকা দেখে গোলাপজান লোভী হয়ে ওঠেন। স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঘুমন্ত নুরুলের উপর দা চালান। কিন্তু পরে দেখতে পান তিনি আসলে ভুলে তার নিজের ছেলেকে মেরে ফেলেছেন। এ ঘটনায় গোলাপজান ও খোরশেদের ফাঁসি হয়। প্রিয়জনদের নিয়ে আনোয়ারার পরিবারের সুখী সমাপ্তি দেখানো হয়।

আনোয়ারা চলচ্চিত্রটির চরিত্রসমূহ ও পারিপার্শ্বিকতা বিশ্লেষণ করলে যেসব ধারণা পাওয়া যায়,

গ্রামীণ মুসলিম পরিবারের জীবনযাপন

এ চলচ্চিত্রে পরিচালক যে দুইটি পরিবার দেখিয়েছেন তাদের উভয়ের আর্থিক সঙ্গতি ভালো। আনোয়ারার বাবাকে গ্রামের লোকজন সম্মান করে। পরিবারের সদস্য হিসেবে একজন গৃহকর্মীও থাকে। এ ছাড়া

আনোয়ারা ও তার সৎ মা গোলাপজানকে সব সময় পরিপাটি পোশাক আর গয়না পরা অবস্থায় দেখা যায়। হালের বলদ, গোয়ালঘর আগুন লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরও মেয়ের বিয়েতে খোরশেদ বড় খাসি জবাই দেয়। গ্রামের এক লোক মন্তব্য করেন,

> বহুদিন পরে এ গাঁয়ের বিয়েতে এত বড় খাসি জবাই হলো। (১: ০৫: ২৭ মিনিট)

অর্থাৎ টাকা কম থাকার পরও নিজের সম্মান রক্ষায় খোরশেদ মেয়ের বিয়েতে ভালোমন্দ খাওয়ায়। দাওয়াত খেতে আসা মেহমানদের বড় খাসি জবাইয়ের বাহবাতে শামিল হতে দেখা যায়।

এদিকে খোরশেদের স্ত্রী বিভিন্ন অজুহাতে শাশুড়ি আর আনোয়ারাকে কথা শোনান। এতে গোলাপজানের সাথে শাশুড়ির প্রতিদিন ঝগড়া হয়। একদিন খোরশেদকে বলতে শোনা যায়,

> তোমরা যদি রোজ রোজ ঝগড়া কর তাহলে আমার মান-ইজ্জত কি থাকবে? কাছারি ঘরে কতো মানুষ। ওরা এসব শুনলে কী ভাববে বলো তো? (৮: ৩৪- ৮: ৪২ মিনিট)

অর্থাৎ, পরিবারের নারীদের আচার-ব্যবহারের ওপর বাড়ির সম্মান নির্ভর করে। মুসলিম পরিবারের একটি বাড়ির মেয়েদের কণ্ঠ বাইরে শোনা গেলে মানুষ ভালো বলবে না। তাই নিত্যকার চলা ঝগড়ার কারণ ও তার সমাধান নিয়ে খোরশেদ যতটা চিন্তিত তার চেয়ে বেশি বিচলিত নিজের সম্মান নিয়ে। এ পরিবারের নারীরা বাড়ির বাইরে যান না। পরিবারের বাইরের পুরুষের সামনে পর্দা মেনে চলেন।

অন্যদিকে আনোয়ারার জীবনসঙ্গী নুরুল এসলামের পরিবারও রতনদিয়া গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন পরিবার। নুরুল বি এ পাস করে বেলগাঁও জুটমিল কোম্পানিতে ভালো পদে চাকরি করে। তাদের নিজস্ব বাড়ি আছে, জমি আছে। পরিবারে সৎ মা, বিবাহিত এক বোন ও দুইজন গৃহকর্মী থাকেন। বাবার সম্পত্তি আর নুরুলের আয়ে পুরো সংসার চলে। এই পরিবারের সধবা নারীরা ভালো পোশাক ও গহনা পরেন।

চলচ্চিত্রের কাহিনি অনুযায়ী বোঝা যায়, আনোয়ারার পরিবার গ্রামীণ মধ্যবিত্ত এবং নুরুলের পরিবার গ্রামীণ উচ্চমধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবার। পাশাপাশি নুরুল পারিবারিকভাবে স্বচ্ছল ও শিক্ষিত এবং তার মধ্যে লোভ নেই। বরং সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে দায়িত্ব পালনে সে সচেষ্ট। তবে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও শিক্ষিত হওয়ার পরও কিছু রক্ষণশীল মনোভাব চোখে পড়ে।

রক্ষণশীল মনোভাব

মুসলিম পরিবারকেন্দ্রিক এই গল্পে কিছু জায়গায় ইসলামিক জীবনচর্চা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কাহিনির শুরুতে নৌকায় বসে নুরুলের কণ্ঠে ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠের শব্দ শোনা যায়। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ওই কণ্ঠস্বর শুনে আনোয়ারা মুগ্ধ হয়। এর কিছুদিন পর অসুস্থ আনোয়ারার চিকিৎসা করে নুরুল। তবে চিকিৎসা শুরুর আগে খোরশেদ আনোয়ারার বান্ধবী হামিদার বাবাকে বলেন,

> পর পুরুষকে মেয়ে দেখাব। এটা কি ঠিক হবে? মানে শরীয়তে... (১৪: ০৭ মিনিট)

১৯১৪ সালে যখন *আনোয়ারা* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় সে সময় সমাজে মুসলমান নারীদের পর্দাপ্রথার বিষয়টি প্রচলিত ছিল। নারীরা ঘরের ভেতরে থাকেন। অন্দরমহল সামলান। জীবনসঙ্গী আর বাবা-ভাই-ছেলে ছাড়া কারও সামনে যান না। কাজী ইমদাদুল হকের রচিত *আবদুল্লাহ* (১৯৩২) উপন্যাসেও এ চিত্র পাওয়া যায়।

চলচ্চিত্রে খোরশেদের চিন্তা অপরিচিত কোনো পুরুষ তার মেয়েকে দেখে ফেললে পাপ হতে পারে। মেয়ের জীবনের আগে সম্মান, পাপ-পুণ্যের হিসাবনিকাশ করতে থাকেন তিনি।

চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রদের মাথায় বেশির ভাগ সময় ঘোমটা টানা থাকে। বাড়িতে অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত কোনো পুরুষ এলে ঘোমটা টেনে আরও লম্বা করেন, এরপর এক হাত দূরে তাদের সরে যেতে দেখা যায়। কখনো বা প্রয়োজনে নারীদের পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতে শোনা যায়। তবে পারিবারিক সব সিদ্ধান্তে অংশ নেন বাড়ির পুরুষরা। যেমন, গোলাপজান তার ভাইয়ের ছেলের সাথে আনোয়ারার বিয়ে ঠিক করেন। আনোয়ারার দাদী তা মেনে নিতে চান না। তিনি খোরশেদকে বলেন,

> শুভক্ষণে দড়ি ছিঁড়ে বড় বালতি পড়ে যাওয়ার পরও তুই আমার আনারকে ওই ডাকাতের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাচ্ছিস? আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না। (৪৪: ২৩- ৪৪: ২৫ মিনিট)

তখন খোরশেদ বলে ওঠেন,

> রেখে দাও তোমাদের মেয়েলি কথা। (৪৪: ২৬ মিনিট)

পরিবারের সবেচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হওয়ার পরও শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে তার মতামততে অগ্রাহ্য করা হয়। খোরশেদ জানিয়ে দেন এ বিয়ে হবে এবং এ কথা না মানলে তিনি নিজেই সংসার ছেড়ে চলে যাবেন।

এদিকে বিয়ের পর থেকে আনোয়ারাকে তার শাশুড়ি বিভিন্নভাবে মানসিক নির্যাতন করতে থাকেন। নুরুল এর প্রতিবাদ করতে চাইলে আনোয়ারা মন্তব্য করে এই বলে,

> ছিঃ! উনি আমাদের মুরুব্বি। দোষ করলে মাথা নিচু করে সইতে হবে। (৫০: ১৯ মিনিট)

বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অন্যায় করলে পুত্রবধূকে সব সহ্য করে নিতে হবে। ভালো পরিবারের মেয়ে কখনো মুখে মুখে তর্ক করে না, এটিও এখানে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া একজন 'ভালো স্ত্রী' স্বামীর প্রতি ভক্তি থেকে স্বামীর পরিবারের সদস্যদের প্রতি তার ভক্তি প্রকাশ করাকে সহজাত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

আবার চলচ্চিত্রের একপর্যায়ে নুরুলের প্রতিপক্ষরা আনোয়ারাকে অপহরণের চেষ্টা করে। এ ঘটনায় পরে মামলা হলে আনোয়ারাকে জিজ্ঞেসাবাদ করার জন্য আসামিপক্ষের উকিল আদালতে আবেদন করেন। এ সময় বাদী পক্ষের উকিল মন্তব্য করেন,

> মহামান্য আদালত, আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, মুসলিম পরিবারের এমন একটি পর্দানশীল, ধর্মবতী, পতিপ্রাণা মহিলাকে কোর্টে হাজির করলে ধর্মের প্রতি আঘাত করা হয়। (১: ৩৬: ৪৫- ১: ৩৬: ৫৫ মিনিট)
>
> একটি ধর্মভীরু নারীকে কোর্টে হাজির করবেন না। (১: ৩৭: ০৪ মিনিট)

এর অর্থ নারী যদি পর্দার বাইরে বেরিয়ে আসেন তবে ধর্মের অসম্মান করা হয়। নারীও অসম্মানিত হন। অথচ একজন মানুষ হিসেবে নারীর অধিকার আছে তার বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করার। কিন্তু সে সময়কার প্রেক্ষাপটে নারী ধর্মীয় অনুশাসনে নিজেকে বেঁধে রেখে সকল অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করেন। বাড়িতে উকিল এসে যখন আনোয়ারাকে পরকীয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করে তখন সে একটি কথারও

জবাব না দিয়ে শুধু 'না, না', 'মিথ্যা কথা' বলে বিড়বিড় করে ওঠে। 'পর পুরুষের' সামনে কথা না বলার অনুশাসনের ফলে কোনো জবাব না দিয়ে আনোয়ারা মাথা ঘুরে পড়ে যায়।

এ ধরনের রক্ষণশীল মনোভাবের পাশাপাশি চরিত্রগুলোর মূল্যবোধ কোনো কোনো সময় দৃঢ়, কোনো কোনো সময় দূর্বল হিসেবে চোখে পড়ে। ফলে সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার দিকটিও ফুটে ওঠে।

মূল্যবোধ ও সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা

*আনোয়ারা'*র কাহিনির শুরুর দিকে নুরুলকে আধুনিকমনস্ক ও উদার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। চিকিৎসক না হওয়ার পরও অসুস্থ আনোয়ারার চিকিৎসা করতে সে রাজি হয়। ওই সময় তার এক সহকর্মী বিরক্ত হয়ে মনে

করিয়ে দেয় যে তারা পাট কিনতে এসেছে। কিন্তু নুরুল তখন তাকে ধমকে বলে ওঠে,

> আহ! চুপ করুন।... সব মানুষের বিপদ- আপদ আসে। (১৪: ৩০ মিনিট)

এ ছাড়া আনোয়ারা সুস্থ হয়ে ওঠার পর খোরশেদ বাড়িতে মিলাদের আয়োজন করে। সেখানে খাওয়া-দাওয়া শেষে নৌকায় ফিরে নুরুলের কর্মচারী নবা জানায়, এত ভালো রান্না সে বহুদিন খায়নি। এ সময় নবা তার স্ত্রীর রান্না ভালো না বলে মন্তব্য করলে নুরুল বলে ওঠে,

> ছিঃ! স্ত্রীর দুর্নাম করতে নেই। (৩৪: ৩৯ মিনিট)

কোম্পানির একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে নুরুল পরিচিত। ব্যবসার লাভ লোকসানের হিসাব সে নিখুঁতভাবে করে। তার অধীনস্ত কয়েকজন কর্মী অন্যায়ভাবে টাকা লোপাটের চেষ্টা করলে তাদের বড় সাহেব হিসেবে সে শাসন করে বলে,

> কোম্পানি আপনাদের বেতন দিয়ে রেখেছে কি টাকা-পয়সা অপচয় করার জন্য? চোরের বাড়িতে কোনোদিনই দালান হয় না- এ কথাটা জানেন তো? (১৯: ১৪- ১৯: ২০ মিনিট)

এভাবে গল্পের শুরুর দিকে বিভিন্ন ঘটনায় দৃঢ়তার সাথে নুরুলকে নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতে দেখা যায়। এর মধ্যে ছিল যাত্রাপথ থেকে অচেনা কলেরা রোগীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার ঘটনা। ব্যবসার কাজে লঞ্চে করে যাওয়ার সময় সেখানে কলেরা রোগী পাওয়া যায়। যাত্রীদের সব ধরনের নিষেধ উপেক্ষা করে সে রোগীকে সেবা করার চেষ্টা করে। উপায় না পেয়ে রোগীকে বাড়িতে নিয়ে আসে। এ নিয়ে মা প্রশ্ন তুললে সে বলে,

> মানুষ তো মানুষেরই জন্যে, আম্মা। ... দু'দিনের দুনিয়ায় বসবাস করতে এসে এত ঘৃণা করলে চলে? আল্লাহ তাআলা নারাজ হবেন যে। (৫৫: ১৮- ৫৫: ৩২ মিনিট)

সে ধর্মভীরু। সৃষ্টিকর্তার বিরাগভাজন হতে না চাওয়ায় সে বিপদে অন্যের সাহায্য করছে। এভাবে অনেক দৃশ্যে নুরুল কারও কথা তোয়াক্কা না করে যেটা যৌক্তিক বলে মনে করছে সেটাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের অনুরোধ, বাইরের মানুষের বাধা কোনোটিই তাকে রুখতে পারেনি। নুরুলের বাড়িতে আশ্রিত

কলেরা রোগীটি ছিল আনোয়ারার বান্ধবী হামিদার স্বামী। নুরুলের সাহায্যের জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে নুরুল বলে ওঠে,

> ...আমি যা করেছি তা সব মানুষেরই কর্তব্য। একে অন্যকে যদি সাহায্যই না করলাম তাহলে আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন? (৫৭: ৩৬- ৫৭: ৪৩ মিনিট)

আবার লোকে কী বলল তা নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করতে আগ্রহী নয় নুরুল। কাহিনিতে সৎ মা যখন বলে তার বিয়ে দেওয়া নিয়ে প্রতিবেশীরা নানা রকম কথা বলছে তখন সে মন্তব্য করে,

> কে কী বলল তা নিয়ে মাথা ঘামালে কি আমাদের চলবে? (৪১: ৪৭ মিনিট)

পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে নুরুলকে কোনোদিন তার মায়ের সাথে উঁচু স্বরে কথা বলতে দেখা যায় না। কিন্তু যেকোনো বিষয়ে সে তার অবস্থান সব সময় পরিস্কার রেখেছে। বিয়ের পর নুরুলের মা আনোয়ারার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে থাকলে সে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে,

> তাই বলে মুরুব্বিয়ানার সুযোগ নিয়ে দিন-রাত তোমার উপর অত্যাচার করবে? (১: ১৬: ০৭ মিনিট)

মায়ের ব্যবহারকে অন্যায় ভেবে সে প্রতিবাদ করলে তার মা বলেন,

> বউয়ের জন্য দরদ একেবারে উপচে পড়ছে। (১: ১৬: ২০ মিনিট)

তখন দৃঢ়তার সাথে নুরুল উত্তর দেয়,

> সে রকম লোক কিন্তু আমি নই। (১: ১৬: ২৩ মিনিট)

এখানে নুরুলের মানসিক উদারতা হঠাৎ পুরুষালি হয়ে পড়ে। আনোয়ারা একজন স্ত্রী হওয়ার আগে একজন মানুষ সেটি তার মনে থাকে না। মানুষের জন্য দরদ থাকার মতো স্বাভাবিক অনুভূতিকে পৌরুষত্বের দুর্বলতা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এখানে নুরুল এবার নিজেকে মানুষ নয়, পুরুষ হিসেবে তুলে ধরে।

ঘটনাক্রমে স্ত্রীর নামে যখন পরকীয়ার অভিযোগ ওঠে তখন তার সেই প্রতিবাদী কণ্ঠ আর শোনা যায় না। আসামি পক্ষের উকিল যখন আনোয়ারাকে জেরা করতে আসে তখন সে পালিয়ে যায়। পরে হামিদার স্বামী যিনি আনোয়ারার পক্ষের উকিল, তাকে নুরুল বলে,

> 'উফ! আমি আর পারছি না। এর চেয়ে আমার মরণ ভালো ছিল। (১: ৩৯: ২০ মিনিট)

আনোয়ারাকে চেনার পরও সে কোনো কিছুর প্রতিবাদ করে না। উকিল নুরুলকে বোঝায় তার স্ত্রী কত 'সতী'। অন্য পুরুষের কাছ থেকে নিজের স্ত্রীর চরিত্রের মৌখিক সনদ নেওয়া লাগে। এরপর নুরুলকে বলতে শোনা যায়,

> আমি সব জানি। কিন্তু কী করে আমি মানুষের মুখ বন্ধ করব? আর কী করে আমার এ মুখ আমি মানুষকে দেখাব? (১: ৩৯: ৩৭ মিনিট)

শিক্ষিত ও আধুনিক নুরুলকে তখন আর উদার মনে হয় না। ঘরের সম্মান নারী–তার এই পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব এখানে ফুটে উঠে। অন্য পুরুষ নারীকে দেখে ফেললে সম্মানহানি হয়, অপহরণ করলে সতীত্বে দাগ

পড়ে–এমন ধারণা থেকে সে বের হতে পারেনি। সম্পর্কে ভালোবাসার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে লোকলজ্জার ভয়। শিক্ষিত হওয়ার পরও পুরোনো সংস্কার যে নুরুলের মনে শেকড় গেড়ে আছে তা বোঝা যায়।

এদিকে বিয়ের আগে যেমন আনোয়ারা মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতো বিয়ের পরও সে অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। আনোয়ারা কোনোবারই এর প্রতিবাদ করে না। তার শাশুড়িও তাকে একইভাবে নির্যাতন করেন। নুরুলের কর্মচারী নবা প্রতিবাদ করতে গেলে আনোয়ারা বলে,

> ছিঃ! চুপ কর। মুরুব্বিদের অমন কথা বলতে নেই। (১: ১৪: ৪০ মিনিট)

আবার একসময় নুরুল তার মায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে আনোয়ারা তাকেও নিবৃত্ত করতে চায়। সম্পত্তি ভাগ করে নুরুল ও তার মা আলাদা হয়ে গেলে আনোয়ারা কাঁদতে কাঁদতে বলে,

> আমি এ ঘরে পা দিতে না দিতেই এ সংসারটা দুভাগ হয়ে গেল। (১: ১৮: ৪৪ মিনিট)

সমাজ আনোয়ারাকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যে সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে না। স্বামী ও সংসারকে একত্রে রাখতে না পারলে সে ব্যর্থ নারী। গঞ্জনা- অপমান সহ্য করেও আনোয়ারা স্বামীর প্রতি অনুগত থাকে। যক্ষ্মা আক্রান্ত স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে সে যখন অপহৃত হয় তখন নুরুল কিন্তু তার পাশে এসে দাঁড়ায় না। বরং লোকলজ্জার ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়। তারপরও আনোয়ারা মনে করে স্বামী তার জীবনের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ। স্বামী না থাকলে তার কোনো অস্তিত্ব নেই।

এর পাশাপাশি এ ধরনের শ্রেণির মানুষ আর্থিক সঙ্গতি ঠিক রাখার জন্য বেশির ভাগ সময় উঁচু শ্রেণির সাথে আপোস করে। নুরুল যেমন প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে। প্রতিষ্ঠান তার প্রতি অন্যায় করলে সে এর প্রতিবাদ করে না। তাই অর্থনৈতিক স্বার্থে আপসকামিতা এ শ্রেণির একধরনের সহজাত স্বভাব হিসেবে দেখা যায়।

অর্থনৈতিক স্বার্থে আপসকামী

সৎ কর্মী হিসেবে পরিচিত নুরুলকে তার কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান বড় অঙ্কের পুরস্কার দেয়। এর কারণ নুরুলের মতো মানুষেরা যাতে আরও পরিশ্রম করে তাদের লাভের খাতা ভরিয়ে তোলে। পুরস্কার পেয়ে নুরুল তার বড় কর্তাকে বলে,

> এ আপনাদের দয়া। (৪৮: ৩১ মিনিট)

উত্তর আসে,

> এ আপনার নায্য প্রাপ্য। (৪৮: ৩৪ মিনিট)

সংলাপগুলো শুনলে বোঝা যায়, নিজের যোগ্যতার ওপর নুরুলের তেমন ভরসা নেই। পুরস্কার পাওয়ার আশায় সে কাজ করছে এমন মনোভাব কোনো দৃশ্যে দেখা যায়নি। তবে পুরস্কার পাওয়ার পর নিজেকে প্রভুভক্ত হিসেবে প্রমাণ করার মনোভাব তুলে ধরেছে।

এদিকে স্বার্থে আঘাত লাগলে মনিব যে তার অধস্তনের বিশ্বস্ততা ভুলে যায় তার প্রমাণও এই গল্পে আছে। নুরুলের প্রতিপক্ষ আট হাজার টাকা চুরি করে তাকে ফাঁসিয়ে দেয়। বড়কর্তা নুরুলকে জানিয়ে দেয় টাকা দিতে না পারলে জেলহাজতে পাঠানো হবে এবং পরে পাঠিয়েও দেয়। হামিদার স্বামীর কারণে নুরুল মুক্তি পেলে তার বড় কর্তা আবার এসে পুরস্কার দিয়ে যান। বড় কর্তার মুখে শোনা যায়,

> মালিকপক্ষ থেকে এই আট হাজার টাকা আপনার ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। (১: ৫২: ৪০ মিনিট)

মানুষের সম্মান যে টাকা দিয়ে কেনা যায় এই দৃশ্যটি তাই তুলে ধরে। টাকা দিয়ে আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সঠিকভাবে বিবেচনা না করে নুরুলের মতো কর্মীকে জেলে পাঠানোর পর সমাজে তার সম্মানহানির বিষয়টি মালিকপক্ষ চিন্তা করেনি। নুরুলকেও এর প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না। পুরস্কার সে ফিরিয়েও দেয় না। অর্থনৈতিক স্বার্থের দিকটি চিন্তা করে এবারও সে আপস করে। সংসার চালাতে মাসিক বেতনের এই চাকুরিটি তার জন্য সুবিধাজনক। তাই একে সে হারাতে রাজি নয়।

নুরুল তার চাকুরি বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে মালিকপক্ষের কাছে নতজানু হলেও পরিবারের নারীদের কাছে নত হওয়াকে সে ভাবে পৌরুষত্বের অভাব। কারণ নারী হবে স্বামী অন্তঃপ্রাণ, আর না হলে খল। পুরুষের চেয়ে সে বুদ্ধিমান হয় না, বাইরের পৃথিবীকে সে নিজের মতো করে দেখতে পারে না। তার পৃথিবী আবর্তিত হয় স্বামী, সংসার, সম্পত্তি, সাংসারিক কূটচালকে ঘিরে।

সংসারে নারী চরিত্রঃ সরল ও কুটিল

চলচ্চিত্রের কাহিনি অনুযায়ী আনোয়ারাকে উপস্থাপন করা হয়েছে সরল, ধর্মভীরু, পর্দানশীল ও পতিব্রতা নারী হিসেবে। তার ছোটবেলার বান্ধবী হামিদার চরিত্রটিও তার মতো। দুই সৎ মায়ের চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে কুটিল ও জটিল মানসিকতার নারী হিসেবে।

ঘরের সব কাজ আনোয়ারাকে দিয়ে করান গোলাপজান। খোরশেদের হাতখরচের টাকা পকেট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখেন। ভয়ে খোরশেদ স্ত্রীকে কিছু বলেন না। এ প্রসঙ্গে গোলাপজান তার ভাইকে বলে,

> ওকে আমি ঘরের ভেড়া বানিয়ে রেখেছি, না! (২৬: ৩৫ মিনিট)

অর্থাৎ নারীর ক্ষমতা পুরুষকে বোকা বানিয়ে রাখা পর্যন্ত। গোলাপজান এমন একটি চরিত্র যার মধ্যে মানুষের প্রতি কোনো সম্মান নেই। মুসলমান পরিবারের 'ভালো বউ' এর সংজ্ঞায় তিনি পড়েন না। বিভিন্ন সময়ে তিনি আনোয়াকে শাপশাপান্ত করেন। আনোয়ারার দুঃসময়ে মজা নেন। কাউকে তিনি তোয়াক্কা করেন না। টাকার প্রতি তার অসম্ভব লোভ। এমনই সে লোভ যে জামাতাকে নিজেই হত্যা করতে যান। তবে ভুল করে নিজের ছেলেকে খুন করে ফেলেন।

পাশাপাশি নুরুলের মা তার প্রয়োজন মতো ছেলের টাকা ব্যবহার করেছেন। সম্পত্তি পাওয়ার জন্য মেয়ের স্বামীর বোন তথা মেয়ের ননদের সাথে নুরুলের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালান। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে নুরুলের উপর ক্ষুব্ধ হন। এরপর থেকে তিনিও আনোয়ারাকে নানাভাবে হয়রানি করেন। তাদের অভিশাপ দেন। নুরুল কারাগারে গেলে তিনি খুশিমনে বলেন,

> গজব পড়েছে। গজব। পটের বিবির ঠ্যাং ভেঙেছে। (১: ৪৪: ১৭ মিনিট)

এই গজবের অর্থ আনোয়ারা ও নুরুল পাপের শাস্তি পাচ্ছে। মায়েদের কথার অবাধ্য হওয়ায় তারা বিপদে পড়েছে। এদিকে আনোয়ারা স্বামী অন্তঃপ্রাণ। সমাজে প্রতিষ্ঠিত 'ভালো স্ত্রী'-র তালিকায় তার নাম লেখা যায়। আনোয়ারা নিজের অধিকার আদায় করতে পারে না। স্বামী ছাড়া তার নিজের কোনো অস্তিত্ব নেই এটাই সে বিশ্বাস করে। স্বামীকে কারাগার থেকে বের করে আনতে টাকার প্রয়োজন পড়লে শরীরে থাকা সব সোনার গহনা সে খুলে দিতে থাকে। হামিদা তাকে মনে করিয়ে দেয়, মেয়েদের সব গহনা খুলে দিতে হয় না। এ সময় আনোয়ারার মুখে শোনা যায়,

> মুসলমান মেয়েদের সবচাইতে বড় গহনা হলো তার স্বামী। সে না থাকলে এসব দিয়ে কী করব বলতে পারো? (১: ৪৮: ২৩ মিনিট)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আরেকটি প্রতিফলন সামাজিকভাবে 'স্বামী' খেতাব পাওয়া পুরুষকে দেবতাতুল্য করে তোলার চেষ্টা। নারীর স্বামী থাকা মানে সমাজে সে আহ্লাদিত। না থাকলে বেঁচে থাকার কোনো মূল্য নেই। আনোয়ারা তাই নিজের জীবন দিয়ে হলেও নুরুলকে রক্ষা করতে চায়। অথচ নুরুল কিন্তু আনোয়ারার বিপদে পালিয়ে বেড়ায়।

৩.৪.৩ *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০)

জহির রায়হান *জীবন থেকে নেয়া* চলচ্চিত্রটি নির্মাণের পাশাপাশি প্রযোজনাও করেন। এর সংলাপ তিনি লিখেছিলেন আমজাদ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে। এতে অভিনয় করেছেন আনোয়ার হোসেন, রাজ্জাক, রওশন জামিল, সুচন্দা, রোজী সামাদ, খান আতাউর রহমান প্রমুখ।

কাহিনি সংক্ষেপ:

চলচ্চিত্রের গল্প আবর্তিত হয় দুইটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে ঘিরে। একটি পরিবার হলো আনোয়ার হোসেনের পরিবার। তার পরিবারে আছেন দুই বোন আর পুরোনো এক গৃহ সহকারী। এই পরিবারটি একটি সাধারণ পরিবার। বড় ভাই আনোয়ার হোসেন প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী ও আন্দোলনের নেতা। দেশের স্বার্থে বিভিন্ন আন্দোলন- সংগ্রামে তার অংশগ্রহণ থাকে। এ জন্য বেশ কয়েকবার তিনি কারাবরণ করেন। তার দুই বোন- সাথী ও বিথী। বড় বোন সাথী সংসারের দেখভাল করে আর ছোটজন বিথী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। পুরো পরিবার বড় ভাইয়ের নির্দেশে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও আন্দোলনে অংশ নেয়।

আরেকটি পরিবার হলো রওশন জামিলের। এই পরিবারকে ঘিরে মূলত কাহিনিকে এগিয়ে যায়। বড় বোন রওশন জামিলের কর্তৃত্বে পুরো সংসার চলে। তাঁর স্বামী খান আতাউর রহমান পেশায় উকিল, স্বভাবে নিরীহ গোছের। স্ত্রীর কথার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস কখনো পান না। সংসারের সব ক্ষমতা রওশন জামিলের হাতে থাকায় বাড়িজুড়ে কঠিন নিয়ম জারি করেন তিনি। তাঁর মতের বিরুদ্ধে গেলে সবাইকে তিনি কঠোরভাবে শাসন করেন, শাস্তি দেন। রওশন জামিলের দুই ভাইয়ের মধ্যে বড়জন আনিস পেশায় উকিল ও আর ছোটজন ফারুক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আনিসও বড় বোনের বিরুদ্ধে কিছু বলার জোর পায় না। আর ফারুক বোনের চোখ এড়িয়ে স্বৈরাচার শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন করে। এই আন্দোলন সূত্রে তার পরিচয় হয় সহপাঠী বিথীর সাথে। পরে তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এদিকে সংসারে স্ত্রীর কর্তৃত্ব কমাতে গোপনে ঘটকের সাথে শলাপরামর্শ করে আনিসের সাথে সাথীর বিয়ে দেন খান আতাউর রহমান। না জানিয়ে ঘরে নতুন বউ নিয়ে আসায় ক্ষুব্ধ হন রওশন জামিল। কারণ তার আশঙ্কা নতুন বউয়ের হাতে সংসারের চাবি চলে যাবে। এতে তিনি কর্তৃত্ব হারাবেন। এজন্য কৌশলে আনিস ও সাথীকে তিনি আলাদা রাখতে শুরু করেন এবং সাথীর গহনাও কুক্ষিগত করেন। সাথীর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চললে ফারুক ঘোষণা দিয়ে বিথীকে বিয়ে করে। এর মধ্যে খান আতাউর স্ত্রীর শাসনের প্রতিবাদ করে ঘরের দেয়ালে অসংখ্য পোস্টার লাগান। বাড়ির সবাই তাতে মৌন সমর্থন দিলে বাড়িতে খাওয়া-দাওয়াসহ ঢোকাও বন্ধ হয়ে যাবে বলে রওশন জামিল হুমকি দেন।

বিথী আসার পর ঘটনাক্রমে সংসারের চাবি সাথী ও বিথীর হাতে চলে আসে। সবকিছু সুন্দরভাবে চলতে থাকে। এসব দেখে রওশন জামিল নতুন কুটকৌশল করতে থাকেন। এর মধ্যে তার দুই ভাইয়ের স্ত্রী একইদিনে সন্তান জন্ম দেয়। তবে সাথীর সন্তানটি মৃত জন্ম নিলে ফারুক তার সন্তানকে সাথীর হাতে তুলে দেয়। সাথী জানতে পারে না শিশুটি তার নিজের নয়। এদিকে সন্তান ও সংসারের চাবিকে কেন্দ্র করে দুই বোনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে সক্ষম হন রওশন জামিল। একসময় আন্দোলন চলাকালে গোলাগুলির মধ্যে পড়ে আহত হয় ফারুক। এ সময় ফারুকের কোনো খবর না পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে বিথী। রওশন জামিল তখন কৌশলে সাথীর হাত দিয়ে বিথীকে বিষ মেশানো পানি পান করান। এ ঘটনায় পুলিশ সাথীকে কারাগারে পাঠায়। ঘটনার শেষে খান আতাউর রহমান ও আনিস আদালতে প্রমাণ করেন, পানিতে বিষ প্রকৃতপক্ষে মিশিয়েছিলেন রওশন জামিল। এরপর আদালত তাঁকে হাজতে পাঠান।

এই চলচ্চিত্রের শুরুতে কয়েকটি কথা দেখতে পাওয়া যায়, 'একটি দেশ, একটি সংসার, একটি চাবির গোছা, একটি আন্দোলন, একটি চলচ্চিত্র'। গায়েন (২০১৩) তাঁর গবেষণার একটি অংশে উল্লেখ করেন, এই চলচ্চিত্রটিকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র' হিসেবে দেখা যায়। কারণ এখানে সার্থকভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক উপস্থাপন চেষ্টা করা হয়েছিল।

রহমান (২০১৬) জানান, এটি জহির রায়হানের রূপকধর্মী চলচ্চিত্র। ৫২'র ভাষা আন্দোলন জহির রায়হানকে প্রভাবিত করেছিল বলে তিনি চেয়েছিলেন এই বিষয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে। কিন্তু তৎকালিন সরকার অনুমতি না দেওয়ায় তিনি কৌশল অবলম্বন করে *জীবন থেকে নেয়া* নির্মাণ করেন। সাধারণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্পকে ঘিরে তিনি তুলে ধরেন সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান।

দৈনিক সংবাদ-এর সূত্র ধরে তিনি উল্লেখ করেন,

> 'দৈনিক সংবাদ'-এ এক সাক্ষাৎকারে জহির রায়হান বলেন, "যদি পত্রিকার পৃষ্ঠায় গণআন্দোলনের খবর লেখা যেতে পারে- তবে সে আন্দোলনকে বিষয়বস্তু করে চলচ্চিত্র করা যাবে না কেন? এদেশের কথা বলতে গেলে রাজনৈতিক জীবন তথা গণআন্দোলনকে বাদ দিয়ে চলচ্চিত্র কি সম্পূর্ণ হতে পারে? আমি তাই গণআন্দোলনের পটভূমিতে ছবি করতে চাই।"(রহমান, ২০১৬)

মূল্যবোধ ও ভদ্রলোকী জীবন

এই চলচ্চিত্রে দুই পরিবারেই শিক্ষিত সদস্য আছেন। এর মধ্যে আনোয়ারের পরিবারটি মধ্যবিত্ত ও সংস্কৃতিমনা। প্রয়োজনীয় আসবাবে সাজানো একতলা বাড়ি বসবাস তাদের। ভেতরে ঘরের দেয়ালে বিশ্বকবি

রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছবি ঝোলানো। আনোয়ারের নির্দেশনায় বাড়িতে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চর্চা হয়। বড় ভাই সুযোগ পেলেই দেশকে ভালোবাসার অনুভূতি ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। একইসঙ্গে ভাইয়ের সাথে দুই বোন হারমোনিয়াম বাজিয়ে প্রভাত ফেরির গান অনুশীলন করে। পরিবারের নারী-পুরুষ সব সদস্য ভোরে খালি পায়ে প্রভাতফেরিতে অংশ নেয়। শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে চলা আন্দোলনে অনেক সময় দুই বোন–সাথী ও বিথীকে ভাইয়ের সাথে যোগ দিতে দেখা যায়।

বাড়ির সদস্যরা সাধারণ কিন্তু পরিপাটি পোশাকে থাকেন। বিশেষ করে নারীরা সব সময় সেজেগুজে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। বাড়ির প্রতিটি সদস্যের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ়। বড় ভাই হিসেবে আনোয়ারের সব ধরনের সিদ্ধান্ত দুই বোন বিনা বাক্যে মেনে নেয়। সাথী তার ছোট বোন বিথীকে নিজের সন্তানের মতো যত্ন করে। একইসঙ্গে তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও আছে। মুখ তুলে বিথীকে ভাত খাওয়ানোর সময় সাথী বলে,

> ... বিয়ের পরেও কি তোকে আমি শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে রোজ রোজ খাইয়ে আসব নাকি? (৩: ৪৯ মিনিট)

এরপর বিথী বলে ওঠে,

> জানিস আপা, বিয়ের পর আমি তোকে ছাড়া একা থাকতে পারব না। (৪: ০০ মিনিট)

দুই বোনের সম্পর্ক বলা যায় স্নেহ ও আহ্লাদে পরিপূর্ণ। তাদের স্বপ্নও সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক মধু কখনো ভাই, কখনো বাবার মতো তিন ভাই-বোনকে আগলে রাখার চেষ্টা করেন। আনোয়ার হোসেন জেলে বন্দী থাকলে তিনি সাথী-বিথীর দেখভাল করেন। দুই বোনের বিয়ে পরও তাকে সামাজিক বিভিন্ন আচার পালনে সচেষ্ট দেখা যায়। সাথীর হবু বর আনিসকে তিনি জানান,

> দুটি বোন, ওরা আমার কথার বাইরে যায় না। যা বলি তাই শোনে। (৩৮: ৫৮ মিনিট)

পরিবারে মধুর স্নেহের একটি প্রভাব বোঝা যায়। তার দেওয়া উপদেশ, আদেশ নিয়ে এ পরিবারের কেউ কখনো তর্ক করে না। নিম্নবিত্ত হিসেবে তিনি এতটুকু ক্ষমতার চর্চা করতে পারেন।

বড় বোন সাথীর তুলনায় বিথী বেশি সক্রিয়। সাথী যতটা চুপচাপ ও লাজুক, বিথী ততটাই মুখর ও চঞ্চল। বিয়ের পর সাথী তার শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতন সহ্য করে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে বিথী সহজে অন্যায় মেনে নিতে রাজি হয় না। তার ভেতর আত্মসম্মানবোধও আছে। সাথীর বিয়ের পর তার শ্বশুড়বাড়িতে বিথী ও মধু সাথীকে দেখতে যায়। এ সময় রওশন জামিল তাদের অপমান করে। এ ঘটনার পর বড় বোনকে শিক্ষা দিতে বিথীর বন্ধু ও প্রেমিক ফারুক তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে বিথী বলে ওঠে,

> চোরের বোন বলে আমাকে যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই বাড়িতে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছ? এমন আশা তুমি কী করে করলে, ফারুক? (১: ০৪: ২৮- ১: ০৪: ৩৪ মিনিট)

ফারুকের সাথে তার ভালোবাসার সম্পর্ক থাকলেও এর দোহাইয়ে সে বিয়েতে রাজি হতে চায় না। কারণ অপমানিত হওয়ার পরও ওই বাড়ির সদস্য হওয়ার বিষয়টি তার আত্মসম্মানবোধে লাগে। নিজের মর্যাদা

সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তি কখনো অন্যের সামনে নিচু হতে চায় না। বিথীর মধ্যে তেমন মনোভাব আছে। তবে পরে সাথীকে একরকম উদ্ধার করার জন্যই ফারুককে বিয়ে করে বিথী।

এদিকে আনিস ও ফারুকেরা বড় দোতলা বাড়িতে থাকেন। এই পরিবারে আনিস ও তার ভগ্নিপতি পেশায় উকিল। আনিসের আয়ে সংসার চলে। পরিবারের কর্ত্রী রওশন জামিল সব সময় সেজেগুজে পরিপাটি থাকেন। বাড়িতে গৃহকর্মী দুইজন। নারী গৃহকর্মীটি কর্ত্রীর পানের বাটা নিয়ে সারাক্ষণ তাঁর পিছে ঘোরে। আর কর্ত্রী চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে বাড়িময় ঘুরে ফরমায়েশ দেন এবং শাসন করেন। পুরুষেরা অফিসে যান স্যুট-টাই পরে। আর ঘণ্ডে পরেন পাঞ্জাবি- পায়জামা ও শার্ট- প্যান্ট।

খান আতাউর ফৌজদারি উকিল। তিনি মিথ্যা বলতে পছন্দ করেন না বলে আদালতে যেতে আগ্রহী নন। ওকালতি না করার জন্য স্ত্রী তাকে কথা শোনালে তিনি বলেন,

> ...ওই কোর্টে দাঁড়িয়ে রোজ রোজ একশ একটা মিথ্যা কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। (১৪: ৪০ মিনিট)

পরিচালক বোঝাতে চান, মক্কেলের প্রয়োজনে উকিলদের মিথ্যা বলতে হয়। যিনি এটি করতে পারেন, তিনি কেস পান। কিন্তু খান আতা কেস পান না। কারণ তিনি মিথ্যা না বলার নীতিতে অটল। টাকার প্রতিও তার মোহ নেই। সংস্কৃতিমনা হওয়ায় তিনি গানকে ওকালতির চেয়ে বেশি পছন্দ করেন। এই পরিবারে তিনি কৌশলে অনেক কিছু পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন।

আনিস পরিবারে শান্তশিষ্ট, ভীতু মানুষ হিসেবে উপস্থাপিত। ভগ্নিপতি ওকালতি না করতে পারলেও সে ওকালতি চালিয়ে যায়। কিন্তু বাড়িতে বোনের ভয়ে সারাক্ষণ তটস্থ থাকে। আবার বোন বড় বলে তাকে সম্মানও করে। ফারুক যখন বোনের বিরুদ্ধে গিয়ে বিথীকে বিয়ে করে তখন সে বলে,

> হাজার হোক সে তোর নিজের বোন। তার সঙ্গে রাগারাগি করে এমন একটা কাণ্ড করে বসলি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু ভালো না। (১: ০৬: ৩৬ মিনিট)

অর্থাৎ বোন ভালো মানসিকতার না হলেও পরিবারিক মূল্যবোধ তাকে বলছে বড়দের সম্মান করতে হয়। এ জন্য না বলে বিয়ের করার মতো একটি ঘটনাকে সে মেনে নিতে পারে না। এর আগে দেখা যায়, নিজের বিয়ের সময় সে বড় বোনকে না জানিয়ে বিয়ে করতে কুণ্ঠাবোধ করে। এ সময় তার মনের মধ্যে ভয় ও দ্বিধা– দুইটাই কাজ করতে থাকে। আবার ভগ্নিপতিকেও সে জোর গলায় 'বিয়ে করবে না' বলে জানিয়ে দিতে পারে না। পরে রওশন জামিল সাথীকে নানাভাবে হয়রানি করলে তার প্রতিবাদ করতেও সে ভয় পায়।

এদিকে ফারুক কাহিনির শুরুতে বড় বোনের শাসনে অল্পবিস্তর চুপচাপ থাকলেও একসময় সাথীর প্রতি অত্যাচার হতে দেখে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। রওশন জামিলকে বলে,

> এ সংসারে অনেকদিন রাজত্ব করেছিস তুই। এখন থেকে রাজত্ব করবে ওই ভাবি। (১: ০৪: ০১ মিনিট)

ফারুকের সাথে বিথীর বিয়ের পর আনিস যখন বড় বোনের বিরুদ্ধে যাওয়া ঠিক হয়নি বলে ফারুককে বোঝনোর চেষ্টা করে তখন ফারুক বলে ওঠে,

> বাড়াবাড়ি আমি করছি, না তোমার ওই বোন? আমার ওপর যে অত্যাচার করছে কোনো আপন বোন তা করে? (১: ০৬: ৪২- ১: ০৬: ৪৬ মিনিট)

পারিবারিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে সবাই মনে করেন বড় বোনের মতো ব্যক্তিদের দায়িত্ব হলো সংসারকে আগলে রাখা। বাড়ির ছোটদের সুবিধা- অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখা। এ ক্ষেত্রে রওশন জামিল ব্যতিক্রম। তিনি খলচরিত্রগুলোর মতো নিজের স্বার্থের বাইরে কাজ করেন না। পরিবারের ভালোর চাইতে ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে বেশি ভাবেন। ছোটভাই ফারুক একমাত্র ব্যক্তি যে তার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করে না।

স্বার্থপরতা

রওশন জামিলের উচ্চমধ্যবিত্ত এবং আনোয়ারের মধ্যবিত্ত পরিবারে অবস্থানকারী গৃহকর্মী ও তত্ত্বাবধায়ক- এ দুই পেশার মানুষদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে স্বার্থপরতার মনোভাব যুক্ত করা হয়েছে। যেমন, আনোয়ারদের বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক মধু। আনোয়ারের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শুরু থেকেই বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকেন। মধু নিম্নবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হলেও সে মধ্যবিত্তের একটি অংশকে তুলে ধরেছে। আনোয়ারের অনুপস্থিতিতে তিনি বাড়ির বড় ভাইয়ের দায়িত্ব পালন করেন। আনোয়ারের প্রতি বিরক্ত হয়ে তিনি বলেন,

> দেশ আর মাটি জাহান্নামে যাক। নিজের কথা ভাব। (২৫: ৫০ মিনিট)

মধু তার এই পরিবারের ভালো ছাড়া কোথায় কী হলো তা নিয়ে ভাবতে আগ্রহী নন। গা বাচানো স্বভাব তার মধ্যে আছে। তিনি মনে করেন, জেল খাটা, মিছিল করার চেয়ে সংসারী হয়ে সহজ একটি জীবন বেছে নেওয়া ভালো।

কিন্তু ঘটনার একপর্যায়ে তিনি ফারুকের নেতৃত্বে চলা মিছিলে হঠাৎ জড়িয়ে যান। অর্থাৎ, কারাগারে থধাকা আনোয়ারের সাথে দেখা কওে রাস্তায় নামতেই অসংখ্য মানুষকে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে স্লোগান দিতে দেখেন। আন্দোলনের গতি ও স্পৃহা তাকে উদ্বেলিত করে। অনেকটা ঘোরের মধ্যে তিনি এতে মধ্যে ঢুকে পড়েন। একপর্যায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

আবার আনিসদের পরিবারের দুই গৃহকর্মীর বাইরের দুনিয়ায় সাথে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা দেখানো হয় না। তারা আন্দোলন- সংগ্রাম কোনো বিষয়ে ওয়াকিবহাল নন। ঘরে তারা ফাইফরমাস খাটেন। দুলাভাই খান আতা ও নতুন বউ সাথীর সাথে তারা একটু কথা বলতে পারেন। আবার বড় বোনের সাথে ফারুকের দূরত্ব তৈরি হলে এ দুইপক্ষের বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করেন পুরুষ গৃহকর্মীটি। আর বাড়ির চাবি সাথীর দখলে এলে নারী গৃহকর্মীটি তার পেছন পেছন ঘোরে। অর্থাৎ, পরিবেশ- পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেও এই শ্রেণির মানুষের ভাগ্যবদল হয় না। তারা যেখানে ছিলেন সেখানেই পড়ে থাকে।

জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ একটি শ্রেণি

আনোয়ার হোসেন রাজনৈতিক কর্মী। অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তিনি রাজপথে সক্রিয় থাকেন। ছোট দুই বোন–সাথী ও বিথীকেও মিছিলে নিয়ে যান। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার বিষয়টি বারবার স্মরণ করিয়ে দেন।

বোনদের উদ্দেশ্যে আনোয়ারকে বলতে শোনা যায়,

> কাল একুশে ফ্রেবুয়ারি, মনে আছে তো? ... ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখিস। আমরা সবাই একসঙ্গে প্রভাতফেরিতে যাব । (৪: ৪৯- ৪: ৫৪ মিনিট)

পরিবারের নারী সদস্যরা প্রভাতফেরিতে যেতে পারবে না বা আন্দোলনে অংশ নিতে পারবে না–এ ধরনের কোনো মনোভাব এ পরিবারে নেই। বরং দেশের জন্য সবাই কাজ করতে পারে এ ধারণা আনোয়ার তুলে ধরেন। বাড়ির মেয়েদের প্রভাতফেরিতে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তে গৃহ সহকারী মধু বিরক্তি প্রকাশ করলে তিনি বলেন,

> শুধু ওরা না। তোকেও যেতে হবে। (৪: ৫৮ মিনিট)

এ মন্তব্যের মাধ্যমে সব শ্রেণির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ইঙ্গিত থাকলেও সামাজিক মর্যাদা বলে মধুকে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন আনোয়ার। তাই মধুর আপত্তি থাকলেও সে নির্দেশ মোতাবেক যেতে বাধ্য।

এদিকে সাথীর বিয়ের ঘটক আনোয়ারকে যখন জিজ্ঞেসা করেন 'দেশ, দেশ' করে তিনি কী পেলেন তখন আনোয়ার বলেন,

> কী পেয়েছি আর কী দিয়েছি তার হিসাব করতে গেলে তো আর দেশকে ভালোবাসা যায় না। দেশকে ভালোবাসতে হয় নিঃস্বার্থভাবে। দেনা-পাওনার হিসাব নিয়ে যারা ব্যস্ত থাকে তারা সর্বনাশ করেছে। (২০: ৩৯- ২০: ৫২মিনিট)

দেশ বলতে দেশের সব শ্রেণি, সম্প্রদায়ের মেলবন্ধন। প্রত্যেকের সমান অধিকার সুনিশ্চিতকরণ। দেনা-পাওনার হিসাব নিয়েই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বিরোধের সূত্রপাত। আনোয়ার সেই অধিকার নিশ্চিত করতেই রাজনীতির ময়দানে নেমেছেন। তবে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা বলতে কোনো ভালোবাসা নেই। ভালোবাসা শব্দটি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মনোভাব প্রকাশ করে। সেই স্বার্থ উদ্ধারে কারাবরণ করতে আনোয়ারের কোনো দ্বিধা নেই।

দেশের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করাতে আনোয়ার এক ফাঁকে সবাইকে নিয়ে গ্রামে ঘুরতে যান। এ সময় তাঁকে বলতে শোনা যায়,

> দেশকে ভালোবাসতে হলে মাঝে মাঝে গ্রামে বেড়াতে আসতে হয়। ঢাকা শহরের ওই বড় বড় বিল্ডিং এর নিচে দাঁড়িয়ে কি দেশের অবস্থা ভাবা যায়? যায় না। (২৫: ২০- ২৫: ২৯ মিনিট)

এর অর্থ গ্রামকে ভালোবাসলে দেশকে ভালোবাসা যাবে। শিকড়কে ভুলে গেলে নিজের অস্তিত্বে টান পড়বে। যান্ত্রিক শহরের হট্টগোলে ঠান্ডা মাথায় ভাবার সুযোগ কম। তাই গ্রাম ও প্রকৃতি ভরসা। তবে যে কারণে গ্রামে আসা সেই গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে দৃশ্যে দেখা যায় না। বড় ভাই এক পর্যায়ে বলেন,

> মধু, ... এ আমার দেশের মাটি, মধু। ... এ মাটি আমার মায়ের মতো বড় আদরের। বড় পবিত্র। আমার সোনার দেশের সোনার মাটিকে কলঙ্কিত হতে দিতে চাই না বলেই তো দেশ দেশ করি। (২৬: ০৫- ২৬: ৩৪ মিনিট)

গ্রাম নিয়ে একধরনের রোমান্টিসিজম বা রোমান্টিকতা ফুটে ওঠে। সবাইকে শোনান অতীতে গ্রামের 'গোলা ভরা ধান', 'পুকুর ভরা মাছ', 'সোনার ফসল' এর গল্প। কিন্তু এসবের পেছনের মানুষগুলোর গল্প বলেন না।

দেশকে তিনি মায়ের সাথে তুলনা করেন। মাকে যেমন সম্মান দেওয়া হয়, দেশকেও সেই একই সম্মান দিতে হবে বলেন। তবে তিনি এটিও বোঝান যে, নারীর জন্য কলঙ্কিত হওয়া নিন্দনীয়। নারীকে হতে হবে 'পবিত্র'। নারী ও দেশকে ভালোবাসার অনুভূতিতে এই পবিত্র থাকা ও কলঙ্কিত হওয়ার সংজ্ঞা এখানে স্পষ্ট হয় না।

ঘটনাক্রমে বিয়ের পাত্র হিসেবে আনিস ঘটকসহ সাথীকে দেখতে এলে আনোয়ার হোসেন সে সময়ও দেশের কথা বলেন। উকিল পাত্রকে পুরোনো আইন বদলে দেওয়ার পরামর্শ দেন। বলেন,

এমন আইন তৈরি কর যাতে এদেশের মানুষ দু'বেলা দুমুঠো ভাত পেট ভরে খেতে পারে। (৩১: ১৬ মিনিট)

পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে আনোয়ারের কাছে দেশের প্রতি ভালোবাসা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চাচ্ছেন প্রত্যেকে যে যার জায়গা থেকে দেশের জন্য কাজ করবে। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ বলে, সমাজের প্রতিটি মানুষের সার্বিক বিকাশ ঘটাতে। এখানে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণি সমাজ বদলে দেওয়ার নেতৃত্ব দিতে পারবে বলা হচ্ছে। দেশকে বদলে দিতে হলে দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। পাত্রের ভগ্নিপতিকে তিনি একসময় বলেন,

দেশকে ভালোবাসতে হবে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে হবে। (৩১: ৩৩ মিনিট)

কথার মাধ্যমে নয়, দেশের প্রতি ভালোবাসা কাজে প্রমাণে বিশ্বাসী তিনি। পাত্রের সাথে কথা বলে বুঝে নিতে চান পাত্র সেই আদর্শ ধারণ করে কি না। পাত্রের ভগ্নিপতি তাঁর কাছে পরিবারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কীভাবে রুখে দাঁড়ানো যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ চাইলে তিনি মন্তব্য করেন,

দেশ আর ঘর সে তো একই কথা। দেশ হচ্ছে বড় অর্থে আর ঘর ছোট অর্থে। (৩৩: ২৫ মিনিট)

সমাজে পরিবারের ভূমিকা কী সে সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, পরিবারকে বলা হয় সভ্যতার একটি সংস্থা। কারণ পরিবার থেকেই একজন মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাস গড়ে ওঠে। সামাজিক রীতির চর্চা হয়। তাই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবার অন্যতম প্রতিষ্ঠান (গিডেনস, ১৯৯৩)। সে হিসেবে তাই ঘরের অন্যায়কে ছাড় দেওয়ার পক্ষে না আনোয়ার।

এই চলচ্চিত্রে সাথীর স্বামী আনিসের পরিবারের একজনের কাছে সংসারের ক্ষমতা বহাল থাকতে দেখা যায়। আনিসের বড় বোনের কথার বাইরে ওই পরিবারের সদস্যরা কোনো কাজ করতে পারেন না। কথাও বলতে পারেন না। সে সময়কার প্রেক্ষাপটে স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের প্রতীকী চরিত্র এই বোনটি। এখানে ঘরটি হলো দেশ, আর তিনি ওই দেশের শাসক।

এদিকে অন্য পরিবারে বাড়ির কনিষ্ঠ সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফারুকও আন্দোলনে অংশ নেয়। মিটিং-মিছিল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বড় বোন এসব জেনে লেখাপড়া বন্ধ করার হুমকি দিলেও তাতে কাজ হয় না। আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেওয়া এই তরুণ পরিবারের অন্যদের তুলনায় সাহসী। বড় বোনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম সে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে। তার বোন স্বামীকে যখন বলেন,

এটা তোমার সংসার নয় যে তোমার কথামতো চলব। এটা আমার সংসার। (১: ০৩: ২৯ মিনিট)

তখন ফারুক বলে ওঠে,

কে বলেছে এটা তোর সংসার? এটা আমাদের সংসার, (১: ০৩: ৩১ মিনিট)

..তবু জোরজবরদস্তি করে ঘাড়ে ওপর চেপে বসে আছে। (১: ০৩: ৫৯ মিনিট)

'আমার' শব্দটির মাধ্যমে ব্যক্তির স্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তা প্রকাশ হয়। নিজের মতো করে, নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করার মনেবৃত্তি থাকে। অন্যরা কী চায়, কী ভাবে তা নিয়ে চিন্তা কম করে। ফারুক এই অবস্থার পরিবর্তন চায়। 'আমাদের' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে পারিবারিক কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সবার সমান অংশগ্রহণের কথা বলে।

এ ছাড়া আনোয়ার ও ফারুককে কাহিনির বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রমিক আন্দোলন অংশ নিতে এবং দেশপ্রেমমূলক গান, বিপ্লবী গান গাইতে দেখা যায়। তাদের সাথে অবস্থানকারী শ্রমিক শ্রেণিকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। কিন্তু এক অর্থে তারা সক্রিয় নয়। বাকিরা যখন বিপ্লবী গান গাইছে, প্রতিবাদে আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ছে, তখন তাঁরা লাঙল কাঁধে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাথীর বিয়ের দিন আনোয়ার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হন। কারাবন্দী হয়ে বাকি বন্দীদের সাথে তাঁকে 'কারার ওই লৌহ কপাট' গানে কণ্ঠ মিলাতে দেখা যায়। ফারুকও একসময় জেলহাজতে আনোয়ারের সঙ্গী হয়। সেখানে এই দুইজনের সঙ্গী হিসেবে যারা বন্দী হন তাদের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণির কাউকে চোখে পড়ে না।

এই চলচ্চিত্রের মূল ঘটনাটি নারীকেন্দ্রিক করে গড়ে তোলা হলেও আদতে পুরুষ চরিত্রগুলো সব সময় প্রধান হিসেবে উঠে এসেছে। নারীদের এখানে সংসারী, কুটচালকারীর বাইরে কিছু ভাবার সুযোগ লক্ষ করা যায় না।

পরিবারে নারীর অবস্থান

তিন ধরনের নারী চরিত্র চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। সংসারী নারী চরিত্রে সাথী, চঞ্চল ও মৃদু প্রতিবাদী নারী চরিত্রে বিথী ও খল চরিত্রে ফারুকের বড় বোন রওশন জামিল।

চলচ্চিত্রের শুরু থেকে সাথীকে কোনো বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে দেখা যায় না। সে ঘর সামলায়, ভাই-বোনদের যত্ন নেয়। ভাই যার সাথে বিয়ে ঠিক করে তাকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে মেনে নেয়। কিন্তু সন্তানকে নিয়ে বিথীর সাথে তার বিরোধ তৈরি হয়। ভাই, স্বামীর বোন কিংবা স্বামীর ওপর সে কথা বলতে না পারলেও বিথীকে সে বলে,

> আমার মেয়ের যদি কিছু হয় তোকে আমি ছেড়ে দেব মনে করেছিস? বিষ খাইয়ে মারব তোকে। (১: ২৫: ৫৫ মিনিট)

বাঙালি নারীর কাছে সন্তান ছাড়া সবকিছু তুচ্ছ, এটাই পরিচালক বোঝাতে চান। নিজের বোনকে সন্তানের মতো স্নেহ দিয়ে বড় করে তুলে সাথী সব ভুলে যায়। সংসারে বোনের চেয়ে স্বামী- সন্তান নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই ধারণাটি প্রকাশ পায়।

বিথীর চরিত্র সাবলীল। তবে একেক সময় তাকেও উপস্থাপন করা হয় পুরোপুরি সাধারণ সংসারী নারীর মতো। মিছিলে যাওয়া মেয়েটির দুনিয়া ঘোরে ঘর-সংসার নিয়ে। সন্তান ও বাড়ির চাবি নিয়ে সাথীর সাথে শুরু হয় মন-কষাকষি। ফারুককে বলে,

> সবই তো তাকে দিয়ে দিয়েছি। বাকি ছিল সংসারের চাবিটা। সেটাও আজ নিয়ে গেছে। (১: ২১: ৪৮ মিনিট)

এ কথার মাধ্যমে বিথীও সংসারের ক্ষমতা চর্চার ইচ্ছা ফুটে ওঠে। সাথীকে নিজের সন্তান দিতে রাজি না হলেও ফারুকের কারণে দেয়। কিন্তু চাবির প্রতি যে তারও বেশ লোভ ছিল তা বোঝা যায়। তাই সেই চাবি সাথীর হস্তগত হওয়ায় বিথী নিজেকে পরাজিত মনে করে। আবার বিয়ের পর ফারুকের বাইরে কাটানোকে সে মেনে নিতে পারে না। অথচ প্রভাতফেরি আর মিছিলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুইজনের পরিচয় ও প্রেম হয়।

খল চরিত্রের রওশন জামিল কঠোরভাবে পুরো পরিবারে নিজের আয়ত্বে রাখেন। তাঁর কাছে সংসারটি শুধু 'তাঁর'। এখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। তাঁর চরিত্র এত নিষ্ঠুর যে তিনি মানুষ হত্যার মতো সিদ্ধান্ত নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

এই দুই মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে সংকীর্ণ মনোভাব, হীনমন্যতা ও দুর্বলতা উঠে এসেছে। চলচ্চিত্র অনুযায়ী তারা দুর্বল ও কুটিল। প্রত্যেক নারী ঘুরেফিরে একে অন্যের বিপক্ষে কাজ করেছে। যেমন, রাজনীতিবিদ ভাইয়ের কাছে বড় হওয়া সাথী-বিথীও সংসারের ক্ষমতা ও দখলদারিত্ব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একে অন্যের প্রতি বিষেদ্গার করে। অথচ এখানে পুরুষ চরিত্রগুলো রাজনীতি করে, চাকরি করে। নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা কাজ করে। তবে নারীদের মতামতকে আমলে নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। সাথীকে যখন রওশন জামিল নির্যাতন করেন তখন আনিস কিছু বলে না। নিজের মতো আদালতে যায় আর আসে। বিথীর আপত্তি সত্ত্বেও ফারুক তাদের সন্তানকে আনিস-সাথীর হাতে তুলে দেয়।

এদিকে নারী মানিয়ে নিতে না পারলে পুরুষ অসন্তুষ্ট হয়। বড় ভাইকে সাথী যখন জানায়, সে বিথীকে বিষ খাওয়ানোর দায়ে অভিযুক্ত তখন ভাই বলে উঠেন,

> এ কথা শোনার জন্য কি আমি তোদের বড় করে ছিলাম? (১: ৩২: ০৬ মিনিট)

ছোটবেলা থেকে লালনপালন করা বড় ভাই একবার শুনেই বিশ্বাস করে ফেলেন যে, সাথী এই কাজ করতে পারে। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়, নারী সংসারে এমন কূটচাল দিতে পারে এবং এগুলো বিশ্বাসযোগ্য। আবার বন্দী ফারুককে বিথী যখন পারিবারিক সমস্যার কথা বলে তখন ফারুক বলে,

> ... তখন কত বুঝিয়েছি, কত করে বলেছি, তোমরা একটু মিলেমিশে থাক। তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করো না। তোমাদের ঝগড়ার সুযোগ নিয়েই তো আজ এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল। (১: ৩৮: ৫৬- ১: ৩৯: ০৫ মিনিট)

ফারুকের কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়, যা নারীর হীনমন্যতাকে প্রতিষ্ঠা করে। পুরুষ জ্ঞান ও মানসিকতায় বড়, তাই তার কথা না শুনলে পরিণতি খারাপ হতে বাধ্য। পাশাপাশি নারীর কূটচালকে নষ্ট করে পুরুষ বনে যান নায়ক। তারা হয়ে ওঠেন নারীর একমাত্র উদ্ধারকর্তা। ভগ্নিপতি ও আনিস আদালতে প্রমাণ করেন বিথীকে বিষ দেওয়ার জন্য দায়ী রওশন জামিল। ভুল বোঝাবুঝি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দুই বোনের মধ্যে তারা মিল করিয়ে দেয়।

৩.৫ সেমিওটিক বিশ্লেষণ

চিহ্ন বিশ্লেষণ পদ্ধতি হিসেবে চলচ্চিত্রগুলোর কয়েকটি ইমেজ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,

.৫.১ *কখনো আসেনি* (১৯৬১)

চিত্র: ১

চিত্র:২

প্রথম ইমেজটি শওকতদের বাড়িতে কোনো এক সকালে। শওকত বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নাশতা করতে বসেছে। এখানে শওকতের পোশাক ও টেবিলে সাজানো তৈজসপত্র দেখলে বোঝা যায়, এমফ পরিবারে অভাব নেই। বাসিন্দারা শৌখিন। দ্বিতীয় ইমেজে রাতের ঘুমানোর আগে শওকত বই পড়ছে। এর অর্থ শওকত শিক্ষিত এবং শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে তার আগ্রহ আছে। ফ্র্যাঙ্ক এলগারের লেখা এই 'পিকাসো' বইটিতে বিশ্ববিখ্যাত স্প্যানিশ চিত্রশিল্পী পিকাসোর জীবন ও কাজ সম্পর্কে বলা আছে।[৬]

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, চিত্রশিল্পী পিকাসো নিজে একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন দক্ষিণ স্পেনের শহর মালাগারের একজন চিত্রশিল্পী। তিনি ছবি আঁকায় অধ্যাপনার পাশাপাশি স্থানীয় একটি জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন (ম্যাককালি, ১৯৯৮)। কিন্তু পিকাসো একজন সচেতন শিল্পী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন। ১৯৩৬ সাল থেকে স্পেনে তিন বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধ চলার সময় জার্মান নাৎসি ও ইটালির ফ্যাসিস্টবাহিনী স্পেনের শহর গুয়ের্নিকায় বিমান হামলা চালিয়ে বহু বেসামরিক লোককে হত্যা করে। আহত হয় অনেকে। সেই ঘটনার ভয়াবহতাকে ছবি আঁকার মাধ্যমে তুলে আনেন পিকাসো। পরে জেনারেল ফ্যাঙ্কোর নেতৃত্বে স্পেনে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা হলে একসময় 'গুয়ের্নিকা'-কে তিনি নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অব মর্ডান আর্ট থেকে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু পিকাসো তাতে রাজি হননি। এই চিত্রশিল্প আজও একটি শক্তিশালী যুদ্ধবিরোধী শিল্পকর্ম হিসেবে পরিচিত (জাকারিয়া, ২০১৮)। এ ছাড়া গবেষকদের মতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে পিকাসোর অধিবাস্তববাদ ছবিতে যুদ্ধের ভয়াবহতা, ভীতি, ট্র্যাজেডি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আভাস পাওয়া যায় বলে জানান খান (২০২০)।

পিকাসোর চিত্রকর্মটি বিশ্বজুড়ে নানান সময়ে চলা অন্যায় ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে শওকতের হাতে যখন পিকাসোর জীবনী দেখা যায় তখন মনে হয়, মধ্যবিত্তের ক্ষমতা আছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার। এই শ্রেণির হাত ধরে বিপ্লব সংঘটিত হবে। একজন শিল্পী হিসেবে শওকতের ক্যানভাসে জীবনের গল্প পাওয়া যায়। সেগুলোর ধরন প্রতিবাদী না হলেও তাতে শান্তি, সংগ্রাম ও মৃত্যুর মতো বিষয় উপস্থাপিত হয়।

[৬] থেমস অ্যান্ড হাডসন প্রকাশনী থেকে ১৯৫৫ সালে ফ্র্যাঙ্ক এলগারের গ্রন্থ *Picasso: A Study of His Work* প্রকাশিত হয়।

চিত্র: ৩

চিত্র: ৪

চিত্র: ৫

চিত্র: ৩–এ দেখানো হচ্ছে, শওকতের বাবা চাকুরি করেন। কাজে ভুল হওয়ায় তাঁর উধ্বর্তন কর্মকর্তা রাগারাগি করছেন। কিন্তু তিনি মাথা নিচু করে শুনে যাচ্ছেন। চাকরি চলে যাওয়ার ভয়ে কিছু বলছেন না। এর পরের দুইটি ইমেজে (চিত্র: ৪ ও ৫) বলা হচ্ছে, সুলতান ও শওকতের বাবার মধ্যে কথা হচ্ছে। ধনাঢ্য ব্যক্তি সুলতান তাকে ডেকে অপমানসূচক কথা বলছেন। কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করছেন না। ইমেজে শওকতের বাবা করজোরে কথা বলছেন। আর সুলতান বুকে হাত বেঁধে সোজা দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে বিরক্তির ছাপ। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এভাবে নিজের স্বার্থে পুঁজিপতিদের সামনে নতজানু থাকে। কারণ প্রতিবাদ করতে গেলে চাকুরি, মানসম্মান–সবকিছু খোয়ানোর ভয় থাকে। সমাজে মর্যাদা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা ধরে রাখতে এই শ্রেণি কিছু বলে না।

চিত্র: ৬

চিত্র: ৭

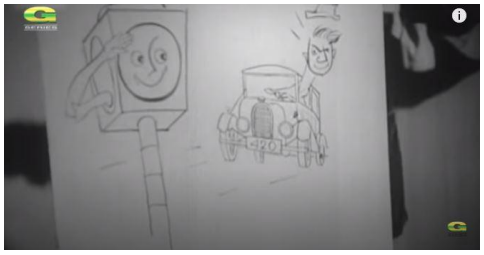

চিত্র: ৮

চিত্র: ৯

চিত্র: ৬ ও ৭–এ দুইটি ইমেজে শওকতের আঁকা ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে। তার ছবিতে শ্রমজীবী মানুষকে দেখা যায়। সাদা পায়রা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুই তরুণীর তার দুই বোনের প্রতিকৃতি। চিত্র: ৮- গাড়িওয়ালা সাহেবের ছবি এঁকে সে বলতে চায় যার কাছে অর্থ আছে তাকে সবাই সম্মান করে। এমনকি শহরের জড়বস্তুগুলোও তাদের নীরবে সালাম দেয়। বাস্তবজীবনের প্রতিচ্ছবি শওকতের আঁকায় দেখা যায়। পাশাপাশি এও বোঝা যায়, শিল্পী হিসেবে শওকতের কাছে জীবনের অর্থ ধরা পরে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে। এ ছাড়া প্রিয় মানুষদের প্রতি অনুভূতি তার কর্মে প্রকাশিত হয়। এক ছবিতে বোনদের শান্তির বাহক যেমন ভেবেছে আবার তেমনি আরেক ছবিতে তাদের মৃত্যুর বার্তাও দিয়েছে (চিত্র-৯)।

চিত্র: ১০

চিত্র- ১১

এ দুইটি ইমেজে শওকতকে প্রতিবাদী হিসেবে চোখে পড়ে। চিত্র: ১০ অনুযায়ী, ঘরের ভেতর রোদচশমা পরা এই তরুণের মতো কেউ কেউ আছেন যারা বাস্তবতাকে একপেশেভাবে দেখেন। সব গল্পের যে নানাধরনের পরত থাকে তা তারা পর্যবেক্ষণ করতে চায় না, যাচাই করতে চায় না। কল্পনা থেকে বেরিয়ে বাস্তবে আসা শওকত তাকে সেটাই বোঝাতে চায়। তাই তরুণের রোদচশমাটি শওকত জোর করে খুলে নেয়। চিত্র: ১১–তে সুলতানের কল্পনার জগতে শওকতের অনুপ্রবেশ নিয়ে দুইজনের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। শওকত এবার সুলতানের আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। বাস্তবতা যখন শওকতকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিচ্ছে তখন সে আর চুপ থাকতে পারছে না। শিল্পী শওকত তখন হয়ে উঠছে মধ্যবিত্তের সেই অংশ যার আবেগকে নাড়িয়ে দিতে পারলে যেকোনো ধরনের পরিবর্তন সম্ভাব্য হয়ে ওঠে। তালুকদার (২০১৯) তাঁর আলোচনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির মাধ্যমে সমাজে কোনো পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে তাদের আবেগ ও যুক্তিকে কাজে লাগানোর কথা বলেন।

চিত্র: ১২

চিত্র: ১৩

চিত্র: ১৪

প্রথম চিত্রে, রোকেয়া ও তার বোন পুতুল খেলছে। অর্থাৎ, নারীর জীবন সংসারকেন্দ্রিক এবং তার জীবনের পূর্ণতা শুধু মাতৃত্বে। এটি বোঝাতে চিত্র: ১২–তে রোকেয়া পুতুল হাতে নিজের সন্তানের কল্পনা করে। চিত্র: ১৩–তে শওকতের আঁকা ছবিতে রোকেয়া ও তার ছোটবোন, যারা তাদের ভাইয়ের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ ও শান্তির জায়গা। পরিবারে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে হোসেন (তারিখবিহীন) বলেন, উনবিংশ শতকের মধ্যবিত্ত পরিবারে গৃহশ্রম দিতেন নারীরা। তারা গৃহে অবস্থান করে রান্না করা, পরিবারের অন্য সদস্যদের সেবা, সন্তান পালনসহ গৃহস্থালি বিষয়গুলো দেখভাল করতেন। ফলে নারীদের গুণ্ডি আপন আলয়ের ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল। যার কারণে তারা পরিবারের পুরুষদের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

চিত্র: ১৪–তে ভাই বাড়ি ছাড়ার পর নির্বাক দুই বোন। জীবন ও মৃত্যু– এ দুইয়ের মধ্যে কোন পথটি তারা বেছে নেবে তার হিসাবনিকাশ চলছে। বাবা- ভাই চলে যাওয়ায় তারা বিপর্যস্ত। পুরুষের প্রতি নির্ভরশীলতা তাদের এতটা দুর্বল করেছে যে তাদের ছাড়া বেঁচে থাকার চাইতে, মৃত্যু তাদের প্ররোচিত করে। তবে আত্মহননের মতো বিষয় রোকেয়া মেনে নিলেও, ছোট বোনটি তা মানতে পারে না। এখানে দুইবোনের দুই দিকে মুখ করে তাকিয়ে চিন্তা করার ভঙ্গিতে মনে দ্বিমুখী ভাবনার প্রকাশ ঘটাচ্ছে।

চিত্র: ১৫

শওকতের মৃত্যুর আগের দৃশ্য এটি। বোনরা মারা যাওয়ার পর খালি বিছানা দেখে শওকত কাঁদছে। পরিবারের জন্য কিছু করতে না পারা এবং দুই বোনের মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে অনুশোচনা বোধ করে সে। শওকতের চোখ ও মুখের অভিব্যক্তিতে তা ফুটে উঠেছে। জীবনের কাছে সে পরাজিত হয়ে মৃত্যুতে নিজের মুক্তি খুঁজে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত শিল্পীর জীবনের একটি বাঁকে যে নিশ্ছিদ্র হতাশা কাজ করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন ঘোষ (২০১৪)। তিনি বলেন, বুর্জোয়াদের কাছে ফিরে যেতে না চাইলে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জন্য যে পথটি খোলা থাকে সেটি হলো বেপরোয়া হয়ে হতাশা ও একাকীত্বে পর্যবসিত হয়ে শূন্যে হারিয়ে যাওয়া। শওকতের মৃত্যু মধ্যবিত্ত জীবনের সেই হতাশাকে সামনে নিয়ে আসে যেখানে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো মুক্তির রাস্তা থাকে না।

৩.৫.২ *আনোয়ারা* (১৯৬৭)

চিত্র: ১৬

চিত্র: ১৭

চিত্র: ১৮

চিত্র: ১৯

প্রথম চারটি ইমেজে আনোয়ারা ও নুরুলের পরিবারের ছবি। প্রথমটি (চিত্র: ১৬) আনোয়ারার বাড়িতে কোনো এক সকাল। ঢেঁকিতে ধান ভাঙা হচ্ছে। এখানে আনোয়ারা, তার দাদী ও সৎ মা ও দুইজন গৃহকর্মী কাজ করছেন। চিত্র: ১৭–তে আনোয়ারার বিয়ের দিন, গ্রামের বহু মানুষের মেহমান হিসেবে আগমনের চিত্র এটি এবং চিত্র: ১৮–এ আনোয়ারার বাবার হালের বলদ ও গোয়াল ঘর পুড়ে যাওয়ার পরবর্তী অবস্থা। শেষ ইমেজে (চিত্র: ১৯) নুরুলের বাড়ি দেখানো হচ্ছে। মা ও বোনের সাথে দুইজন গৃহকর্মী সাহায্য করছেন। চারটি ইমেজের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়ি যে অবস্থাসপন্ন, সেটি বোঝা যাচ্ছে। সমাজতাত্ত্বিক গিডেনস (২০০৭) এর মতে, কৃষক, ব্যবসায়ী ও দোকানদার–পেশার অন্তর্ভুক্তরা প্রথমে মধ্যবিত্ত হিসেবে পরিচিতি পায়। এরপর আর্থিক সঙ্গতির পার্থক্যের কারণে তারা পরে উচ্চমধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত অংশে ভাগ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে শিক্ষিত, ভালো বেতনের চাকুরি ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন শ্রেণি উচ্চমধ্যবিত্তের কাতারে শামিল হয়।

চিত্র: ২০

চিত্র: ২১

চিত্র: ২২

চিত্র: ২০–এ আনোয়ারার বাবা খোরশেদ মিয়া। কাজ ছাড়া অন্য যেকোনো সময় তিনি মাথায় টুপি পড়ে থাকেন। এখানে খোরশেদ মিয়ার মাথার টুপির মাধ্যমে বোঝা যায়, তিনি একজন মুসলিম। এর পরের ইমেজে (চিত্র: ২১) তাঁর পরিবারের নারী সদস্যদের দেখা যাচ্ছে। আনোয়ারার চিকিৎসককে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনেছেন। আর চিত্র: ২২–এ অপহৃত হওয়ার ঘটনায় আদালত থেকে আসামি পক্ষের উকিল এসে জবানবন্দি নিচ্ছেন। গ্রামের মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের নারী সদস্যরা পর্দাপ্রথা মেনে চলে। বাড়ির বাইরের কোনো পুরুষ সামনে এলে দ্রুত নিজেদের আড়াল করেন। কারণ মুসলমানদের কাছে পর্দাপ্রথা সম্মানের বিষয়। এর ব্যাঘাত ঘটার অর্থ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা। তাই যত গুরুত্বপূর্ণ কাজই হোক, পর্দাপ্রথা মেনে চলে তারা। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রবণতা যে মধ্যবিত্তের আছে তা হক (২০১৮) এর *আবদুল্লাহ* উপন্যাস সম্পর্কে করিম (২০০৯)–এর লেখায় পাওয়া যায়। *আবদুল্লাহ*-তে পর্দাপ্রথা, রক্ষণশীলতা, শোষণ সম্পর্কসহ নানা বিষয়ের উল্লেখ আছে। এখানে সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস চরিত্রটি আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েও সম্মান রক্ষায় খানাদানার এলাহি আয়োজন করে, মসজিদ বানানোর সংকল্প করে। আর পর্দার দোহাই দিয়ে পরিবারের নারী সদস্যদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন না। এমন কিছু বিষয় *আনোয়ারা*-তেও লক্ষ্য করা যায়। আবার করিম (২০০৯) তাঁর লেখায়, মুসলমান সমাজে আতরাফ- আশরাফ বিভাজনের কথাও বলেছেন।

চিত্র: ২৩

চিত্র: ২৪

চিত্র: ২৫

চিত্র: ২৬

শুরুর ইমেজটি (চিত্র: ২৩) হলো প্রথমবার খোরশেদের বাড়িতে যখন নুরুল আসে। কোম্পানির একজন উধ্বর্তন কর্তা হিসেবে সে পাট কিনতে আসে। নুরুলের পোশাক আধুনিক এবং সে দাঁড়িয়ে আছে শিরদাঁড়া সোজা করে, পেছনে হাত বেঁধে। অফিসের দলটির নেতৃত্ব যে নুরুল দিচ্ছে সেটি এখানে ফুটে ওঠে। এরপর চিত্র: ২৪–এ সৎ মা নুরুলকে ব্যঙ্গ করে বলেন যে, আনোয়ারার জন্য নুরুলের দরদ উথলে উঠছে। সে তখন দাবি করে, সে সেরকম পুরুষ না। তখন তার দেহভঙ্গিমা টানটান, যা থেকে প্রকাশ যায়, পুরুষ কখনো নতজানু হয় না। অফিসে সে কর্তৃত্ব চালায়। বাসায়ও সে কর্তা এবং স্ত্রীর প্রতি যে পুরুষের দরদ প্রকাশ করে সে দুর্বল।

চিত্র: ২৫ ও ২৬–এ দেখানো হচ্ছে আনোয়ারাকে অপহরণের চেষ্টা করার পরের ঘটনা। একদিকে এ ঘটনা নিয়ে নুরুলকে তার মা তাকে কথা শোনাচ্ছেন। অন্যদিকে হামিদার স্বামী আনোয়ারার 'সতী' থাকার যুক্তি তুলে ধরার পরও নুরুল লজ্জায় চোখে চোখ রাখতে পারছে না। স্ত্রীর প্রতি যে অন্যায় হয়েছে তার প্রতিবাদ না করে কর্তৃত্বশীল পুরুষ এখানে অন্যের কথার ভয়ে লজ্জার অভিব্যক্তি দিচ্ছে। শিক্ষিত এই পুরুষ দুর্বল সংস্কারপ্রথা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। নারীর সতীত্ব তার শরীরে–এই বচন থেকে বেরিয়ে আসার শিক্ষা সে পায়নি। অর্থাৎ, শিক্ষা তার আর্থিক উন্নতি ঘটালেও, মানসিক উন্নতি ঘটাতে পারেনি।

চিত্র: ২৭

চিত্র: ২৮

গ্রামীণ মুসলিম মধ্যবিত্ত সংসারের নারীদের অবসর কাটানোর দৃশ্য। চিত্র ২৭–এ আনোয়ারা ও হামিদা গল্প করছে আর চুলে থাকা উকুন বেছে দিচ্ছে। চিত্র: ২৮–এ নুরুলের পরিবারেও একই দৃশ্য। এর মানে, স্থান আলাদা হলেও নারীর গণ্ডি একই। সে সেজেগুজে থাকবে, সংসার গোছাবে আর ফুরসত পেলে একে অন্যের চুলের উকুন বাছবে। এর বাইরে তার আর কোনো জগত নেই, অন্য জগতের কল্পনাও সে করতে পারে না। নারীর অবস্থার বিষয়ে সুফিয়ান (উদ্ধৃত খান সম্পা., ১৯৯৮: ১০৮) বলেন, নারীদের কোনো মর্যাদা ছিল না। মানুষ হিসেবে তারা কখনো গণ্য হতো না। শুধুমাত্র স্বামী নামধারী পুরুষের জন্য তারা বেঁচে থাকত। তাদের সেবা দিত।

চিত্র: ২৯

চিত্র: ৩০

দুইটি ইমেজে নারীর রূপ একই–স্বামীর সেবাদানকারী। চিত্র: ২৯–এ আনোয়ার তার স্বামীকে পাখা দিয়ে বাতাস করছে। দ্বিতীয় ছবিতে (চিত্র: ৩০) নুরুলের সহকারী নবাকে তার স্ত্রী বাতাস করছে। অর্থাৎ, সুফিয়ানের বক্তব্যের সাথে চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থানের মিল পাওয়া যায়। এখানে নারী সর্বাবস্থায় স্বামীর সেবাদানকারী ও স্বামীভক্ত।

চিত্র: ৩১

চিত্র: ৩২

প্রথম ছবিতে (চিত্র: ৩১) নুরুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী সতীশ। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে তিনি বোঝাচ্ছেন যে, কেন নুরুল অর্থ আত্মসাৎ করতে পারেন। এখানে কর্মকর্তার সামনে তিনি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। অধীনস্ত বড় সাহেবের সামনে বিনয় প্রকাশের চেষ্টা করছেন যাতে বড় সাহেব তার যুক্তি মেনে নেন। অর্থ এবং উচ্চবিত্তের কাতারে নিজেকে দাঁড় করাতে অনেক সময় মধ্যবিত্ত হঠকারী হয়ে ওঠে। চৌধুরী (২০২০)–এর মতে, মধ্যবিত্ত সব সময় উচ্চবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে চায়। তিনি দাবি করেন, মধ্যবিত্ত মৃত্যুর চেয়েও ভয় পায় সমাজের চোখে নিচে নেমে যাওয়ার মতো বিষয়কে।

চিত্র: ৩২–এ প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া পুরস্কার নিচ্ছে নুরুল। অথচ প্রতিষ্ঠান বিনা দোষে তাকে জেলে পাঠিয়েছিল। এখানে বোঝানো হয়, প্রতিষ্ঠান তার লাভের জন্য মধ্যবিত্তকে পুরষ্কৃত করে। আর নিজ স্বার্থ ও সুবিধা টিকিয়ে রাখতে মধ্যবিত্তও তা চুপচাপ গ্রহণ করে। রাইটের (১৯৭৯) তত্ত্ব অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষের সাথে সুসম্পর্ক থাকলে মধ্যবিত্ত কিছু সুবিধাভোগ করে। কারণ এই শ্রেণি শ্রমিকদের ওপর ক্ষমতাচর্চা করতে পারে। তাদের কাজের মূল্যায়ন করতে পারে যা, কর্তৃপক্ষের মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়ক। ফলে সে মধ্যবিত্তকে পুরস্কৃত করে নিজের আয়ত্তে রাখে। ফলে নুরুলের মতো মানুষ বিনা দোষে অপমানিত হওয়ার পরও ধনিক শ্রেণির আজ্ঞাবহ থাকে।

চিত্র: ৩৩

চিত্র: ৩৪

চিত্র: ৩৫

চিত্র: ৩৬

চিত্র: ৩৩ থেকে ৩৫–এ তিনটি ইমেজে যাদের দেখা যাচ্ছে তারা প্রত্যেকে এই চলচ্চিত্রের খলচরিত্র এবং নারী। এই নারীরা তাদের স্বামী ও সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তারা স্বার্থপর ও লোভী। পুরুষকে তারা নানা অপরাধ কর্মে প্রলুব্ধ করতে পারে। আবার পুরুষের প্রলোভনে অন্যের ক্ষতি করতের দ্বিধা করে না। নারী হয়ে নারীর বিরুদ্ধাচরণ করে। চিত্র: ৩৬–এ প্রার্থনারত আনোয়ারার ইমেজ। এই তিন নারীর বিপরীতে তাকে উপস্থাপন করা হয়েছে 'আদর্শ স্ত্রী' হিসেবে যিনি ধর্মপরায়ণ, পতিব্রতা ও নিষ্ক্রিয় ।

৩.৫.৩ *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০)

চিত্র: ৩৭

চিত্র: ৩৮

চিত্র: ৩৯

চিত্র: ৪০

চিত্র: ৩৭ থেকে ৪০–এ রাজনৈতিক কর্মী আনোয়ারের পরিবারকে দেখানো হয়েছে। আনোয়ার প্রভাতফেরির পোস্টার তৈরি করছেন। সাথী-বিথীকে গান গাওয়ার জন্য বলছেন। পরিবার নিয়ে প্রভাতফেরিতে গেছেন। এরপর সাথীর বিয়ের আয়োজন করছেন। এই পরিবারটি শিক্ষিত ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন। বসার ঘরের

দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের ছবি ঝুলছে। এর অর্থ তারা সংস্কৃতিমনা। বাঙালি সংস্কৃতিকে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে তারা ধারণ ও লালন করে। চৌধুরী (২০২০) এ বিষয়ে বলেন, বাঙালি সংস্কৃতি গঠনে মধ্যবিত্তের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কারণ তারা সংস্কৃতমনা। তারা সাহিত্য, নাটক, গান, চিত্রকলার মতো শিল্পকলার মাধ্যমে নিজেদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ টেনে আনেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের, যারা সংস্কৃতি দিয়ে আত্মপরিচয় নির্মাণ করেছেন।

চিত্র: ৪১

চিত্র: ৪২

চিত্র: ৪৩

এ তিনটি (চিত্র: ৪১ থেকে ৪৩) ইমেজ রওশন জামিলের পরিবারের। চিত্র: ৪১–এ বড়বোন রওশন জামিল তার ছোট ভাই ফারুককে শাসন করছেন। দ্বিতীয় ইমেজে তিনি রান্নাঘরে গৃহকর্মীদের তদারক করছেন। চিত্র: ৪৩– এ তার স্বামী খান আতাউর বাড়ির ছাদে গান গাইছেন। প্রথম দুইটি ইমেজের মাধ্যমে এটি একটি উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার সেটি বোঝা যাচ্ছে। শেষের ইমেজে গান গাওয়ার দৃশ্যটি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, এই বাড়িতে খান আতা সাংস্কৃতিক চর্চা করেন। আর এর মাধ্যমেই নিজের প্রতিবাদ জারি রাখেন। বলা যায়, গণমুক্তির আন্দোলনে সাংস্কৃতিক চর্চার যে একটি গুরুত্ব আছে তা খান আতার 'দুলাভাই' চরিত্রটির মাধ্যমে বলা হচ্ছে। এই ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলা যায়। প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়।

চিত্র: ৪৪

চিত্র: ৪৫

চিত্র: ৪৪ ও ৪৫– এ ফারুক মিছিলের মধ্যে তার সহপাঠী বিথীকে খুঁজছে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ফারুক সে সময়কার স্বৈরাচারী শাসকের বিরদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেওয়া সাহসী তরুণদের প্রতীক। মিছিলে বহন করা প্ল্যাকার্ডগুলো থেকে আন্দোলনের পেছনের দাবিগুলো উঠে এসেছে। প্রথম ইমেজ অনুযায়ী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমাজের নিম্নবর্গকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। তারাই শ্রমিকদের কণ্ঠস্বর। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের দেখানো পথে পুঁজিবাদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তারা লড়াই চালিয়ে যাবে বলে দেখানো হচ্ছে।

চিত্র: ৪৬

চিত্র: ৪৭

চিত্র: ৪৬ ও ৪৭–এ কলকারখানার শ্রমিকরা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য হরতাল করছে। এখানে আনোয়ার ও ফারুক তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। শ্রমিকরা আন্দোলনস্থলে লাঙ্গল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। লাঙল কৃষকশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। এখানে মধ্যবিত্ত তাদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে এমনটি উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে শ্রমিকশ্রেণি এখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মাধ্যমে মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব মেনে নিচ্ছে বলা

হচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণি নেতৃত্ব দেওয়ার যোগত্য রাখে তা এখানে ফুটে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে পোলার্ড (২০০৮)-এর কথাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, মধ্যবিত্ত ছাড়া সমাজের জাগরণ সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী মধ্যবিত্তের কারণে নতুন ইতিহাস গড়ে উঠেছে। তবে রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে শ্রমিকদের মতো শ্রমজীবী হওয়াকে সে মেনে নিতে পারে না। বরং মধ্যবিত্ত শ্রমিকের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে অগ্রগণ্য মনে করে। তার একটি নমুনা ইমেজগুলোতে ফুটে ওঠে।

চিত্র: ৪৮

এ ইমেজে (চিত্র: ৪৮) বিথী তার সন্তান কোলে। আর ঠিক তার পরের দৃশ্যে ওই সময়ে ফারুক রাস্তায় আন্দোলন করছে। অর্থাৎ, নারীর গণ্ডি সংসার আর সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বিথী একসময় ভাইয়ের সাথে মিছিলে অংশ নিত। আর বিয়ের পর সংসারের চার দেয়াল তার জগৎ। তার মানে বিয়ের পর নারীর মধ্যে স্বাধীনতার কোনো স্পৃহা বা চেতনা কাজ করে না। অন্যদিকে পুরুষ স্বাধীনতার চেতনার ধারক ও বাহক। তার জগৎ বিস্তৃত। তার দ্বারা দেশ উদ্ধার সম্ভব, কিন্তু সন্তান লালনপালন না।

চিত্র: ৪৯

চিত্র: ৫০

ফারুকে মিছিলে স্লোগান দিতে দেখা যাচ্ছে চিত্র: ৪৯- এ। পাশের প্ল্যাকার্ডে লেখা 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'। শ্রমিকদের পক্ষে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত এর বিনাশ দাবি করছে। এর পরের ইমেজে (চিত্র: ৫০) গুলিতে আহত ফারুক '১১ দফা মানতে হবে'- প্ল্যাকার্ড ধরে আন্দোলনকারীদের পালিয়ে যেতে মানা করছে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় উত্থাপিত এই ঐতিহাসিক ১১ দফায় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার অর্জনের দাবি তোলা হয়েছিল। তাই নিজের জীবন দিয়ে হলেও ফারুক একে রক্ষা করতে চাইছে।

চিত্র: ৫১

চিত্র: ৫২

চিত্র: ৫৩

চিত্র: ৫১ থেকে ৫২–তে নারীর দুইটি রূপ–সেবাদানকারী ও খল। প্রথম দুইটি ইমেজে সাথী ও বিথী যথাক্রমে সংসার সামলাচ্ছে ও স্বামীর সেবা করছে। শেষ ইমেজে (চিত্র: ৫৩) হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ফারুক-আনিসের বড়বোন রওশন জামিল আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

কখনো আসেনি (১৯৬১), *আনোয়ারা* (১৯৬৭) ও *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০)–এ তিনটি চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলো শ্রেণি অবস্থানের ক্ষেত্রে যে বিষয় পরিলক্ষিত হয় তা হলো চলচ্চিত্রগুলোতে এমন পরিবার ও তাদের সদস্য, পারিপার্শ্বিকতার চিত্রায়ন করা হয়েছে তাতে কয়েকটি শ্রেণি উপস্থাপন দেখা গেছে। একটি হলো ধনিক শ্রেণি, এরপর উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং শ্রমিক শ্রেণি। এ ছাড়া নারীও একটি শ্রেণি হিসেবে এখানে উঠে এসেছে। তবে নির্বাচিত তিনটি চলচ্চিত্রের গল্পে প্রাধান্য ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির, যা কিনা উচ্চ, সাধারণ ও নিম্ন–এই তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রতিটি কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, জাগতিক ন্যায়-অন্যায় ও অর্জন এই শ্রেণিকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। এ ছাড়া এ শ্রেণিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্ট্যাটাস-কো বজায় রেখেছে বলেও দেখানো হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, মধ্যবিত্ত হলো কৃষক-মজদুরের কণ্ঠস্বর। তাদের পাশে নিম্নবিত্তের অংশগ্রহণ নিষ্ক্রিয় এবং মধ্যবিত্ত তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।

১৯৬০- ১৯৭০ সালের মধ্যে জহির রায়হান নির্মিত এসব চলচ্চিত্রের মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপায়নের কয়েকটি দিক চিহ্নিত করা যায়:

- শহুরে উচ্চমধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য একই। এই শ্রেণি ভদ্রলোকী জীবনযাপন করে। আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী তারা শৌখিন ও যৌথ পরিবার টিকিয়ে রাখে। পরিবারের পুরুষদের আয়ে সংসার চলে। এ ছাড়া অন্য সদস্যরা বাবা- মা ছাড়া বাইরের কারও ওপর নির্ভরশীল না।

- পরিবারের বড়দের সম্মান, পারিবারিক শৃঙ্খলা, জ্ঞানচর্চা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, আত্মসচেতনতা, সততা, সৃজনশীলতা–এ ধরনের মূল্যবোধ পরিবারে দেখা যায়। যেমন, বাবার মৃত্যুর পর শওকতের পরিবার আর্থিক অনটনে পড়লে তাকে কারও কাছ হাত পাততে দেখা যায় না। তিনটি চলচ্চিত্রেই বাবা-মা ও সংসারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পরিবারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাড়ির পুরুষদের আগে নারীদের বিয়ের প্রচলন দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া মূল চরিত্রদের সবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সৎ ও পরিশ্রমী–এমন গুণ আছে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার প্রতি আগ্রহ দেখা গেছে। সে সময় নারীদের বাইরের পৃথিবীর সাথে সংযোগ দেখা যায় না। যদি কারও থাকে তবে বিয়ের পর তার চিন্তাভাবনা সংসারকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে বলে দেখানো হয়।

- ধর্মীয় মূল্যবোধের বিষয়টি তাদের পোশাক, রীতি ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। পুরুষের পরনে পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি, কথার মাঝে সৃষ্টিকর্তার নাম, ধর্মীয় গ্রন্থপাঠ, ধর্মীয় সংগীত চিত্রায়িত হয়। আর নারীদর মাথায় ঘোমটা, পর্দার আড়াল থেকে কথা বলা, স্বামীভক্ত হওয়া-এ ধরনের বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে।

- স্বার্থপরতা মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির আরেকটি চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে। এরা নিজের স্বার্থে অন্যায়কে মেনে নেয়। অর্থনৈতিক স্বার্থে উচ্চবিত্তের সাথে আপস করে। সততা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে

কর্তৃপক্ষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। *কখনো আসেনি* চলচ্চিত্রে শওকত নিজের জীবন ও পরিবারের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে পারার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। মরিয়মক ছাড়তে পারে না, ছাড়াতেও পারে না সুলতানের বন্দিশালা থেকে। বোনদেরও ফেলে রেখে যেতে পারে না। একপর্যায়ে বোনদের সে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয়। আবার *আনোয়ারা* চলচ্চিত্রে এক কেরানির প্ররোচনায় প্রমাণ ছাড়াই প্রতিষ্ঠান অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে নুরুলকে কারাগারে পাঠায়। পরে অভিযোগ ভুল প্রমাণ হলে নুরুলকে মোটা অংকের টাকা পুরস্কার দেন। নুরুল বিনা বাক্যে টাকা গ্রহণ করে।

- মধ্যবিত্তের মানসিক দুর্বলতা আছে। অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ না হওয়ায় জীবনের কাছে পরাজয় মেনে নেওয়ার মতো ঘটনা দেখানো হয়েছে । অন্যকে আত্মহত্যার জন্য উসকে দেওয়া ও তাদের মৃতুর পর বিবেকের দংশনে আত্মহত্যা করার মতো বিষয় তুলে ধরা হয়।

  আবার পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব চরিত্রগুলোকে দুর্বল করে তোলে। *আনোয়ারা*-তে আনোয়ারার বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগ উঠলে নুরুল লজ্জায় পালিয়ে বেড়ায়। *জীবন থেকে নেওয়া*–তে আনিস তার স্ত্রীর সাথে ঘটে চলা পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। আর ফারুকের সাথে সহপাঠী বিথীর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে চলা মিছিলে পরিচয়। কিন্তু বিয়ের পর বিথীকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করানো নিয়ে তার মধ্যে কোনো উৎসাহ চোখে পড়ে না। কিন্তু সবগুলো পুরুষ চরিত্র যেকোনো পরিস্থিতিতে নারীর ওপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখে।

- সংকটে পড়লে মধ্যবিত্ত প্রতিবাদ করে। এর আগে না। *কখনো আসেনি*-তে শওকত শুরুতে সুলতানের খামখেয়ালিপনার প্রতিবাদ করেনি। তার ভোগবাদী চিন্তার বিপরীতে তর্কে জড়ায়নি। কিন্তু সে নানা বিষয়ে তার সমমনা ও সমকক্ষ বন্ধুদের সাথে তর্ক করেছে। গল্পের প্রায় শেষের দিকে সুলতান তাকে অপমান করার চেষ্টা করলে সে প্রতিবাদ করে এবং মরিয়মের প্রতি তার অনুভূতি স্বীকার করে। *আনোয়ারা*-তে নিজের সংসারে অশান্তি দেখা দিলে নুরুলকে তার মায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়।

  রাজনৈতিক সংকটে জাতীয়তাবাদী চেতনায় জেগে ওঠা মধ্যবিত্তকে দেখা যায় *জীবন থেকে নেওয়া* চলচ্চিত্রে। নিজেদের অধিকার নিশ্চিত করতে তাদের আন্দোলন করতে দেখা যায়। এ শ্রেণি শ্রমজীবীদের হয়ে তাদের পক্ষে আওয়াজ তোলে। তাদের নেতৃত্ব দেয়। আনিসের ভগ্নিপতি খান আতাউর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ঘরে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি পোস্টার লাগান, শ্যালকের বিয়ে দেন, স্ত্রীর অপরাধ প্রমাণের জন্য আদালতে লড়াই করেন।

- মধ্যবিত্ত শ্রেণি দ্বন্দ্ব টিকিয়ে রাখে। সে উচ্চবিত্তকে তুষ্ট রাখার জন্য কাজ করে। উচ্চবিত্তের ক্ষমতার সামনে কিছু করতে পারার সাহস করে না। এজন্য ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি সুলতানের জাদুঘরে থাকা মরিয়মকে মুক্ত করার সাহস শওকত দেখায় না। মধ্যবিত্ত জীবনসঙ্গী বেছে নেয় নিজ গোত্রীয় শ্রেণি থেকে। *আনোয়ারা* ও *জীবন থেকে নেয়া*'র কাহিনিতে তাই চোখে পড়ে। নিম্নবিত্ত অবস্থাকে সে ভয় পায়। ভালো ঘর, চাকরি, পোশাকে সে এমন অবস্থানে থাকে যে নিম্নবিত্তের কাতারে নামতে তার আত্মসম্মানে লাগে।

- নিম্নবিত্ত কুটিল ও স্বার্থপর। আনোয়ারা'র গল্পে নুরুলের অফিসের কেরানি রতীশ বাবু ও তার সহকারী নুরুলকে অপদস্থ করার জন্য আনায়ারাকে অপহরণের চেষ্টা করে। অর্থ চুরি করে নুরুলকে জেলে পাঠায়। আবার *জীবন থেকে নেওয়া*- এ আনোয়ারের বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক মধুর চিন্তা পরিবারকেন্দ্রিক। দেশের কী হলো, দেশের মানুষের কী হলো তা নিয়ে ভাবতে রাজি নন। আনোয়ারে আন্দোলন, কারাবরণ-সবকিছুকে তিনি ঝামেলা মনে করে বিরক্ত হন।

- মধ্যবিত্ত পরিবারের পুরুষদের শিক্ষা, রাজনীতি, অফিস, আদালত সব জায়গায় বিচরন আছে। রাজনৈতিক চেতনা তাই শুধু পুরুষ ধারণ করে। পরিবারে নারীর উপর তার অবাধ নিয়ন্ত্রণ চলে। সংসারী না হলেও সমাজ তাকে কিছু বলে না। এদিকে পৌরুষত্ব দুর্বল হয়ে পড়ার ভয়ে সে নারীর প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান দেখাতে অপরাগ। আবার ক্ষেত্র বিশেষে ঘরে থাকা নারীর নির্যাতনে সে নাকি অসহায়। অথচ দিন শেষে আবার নারীর রক্ষাকর্তা পুরুষ।

- মধ্যবিত্ত নারীর জীবন সংসারকেন্দ্রিক। সেবাদানকারী হিসেবে সে চিত্রায়িত। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মেধা নিয়ে সেভাবে আলোচনা নেই। বরং নারী নিজের স্বার্থে অন্যকে ব্যবহার করতে পারেন। সে কুটিল ও পরিবার অশান্তি সৃষ্টিকারী। মরিয়ম, গোলাপজান, নুরুলের সৎ মা, আনিসের বড় বান, সাথী-বিথীর চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়–নারীরা নারীদের শত্রু। মরিয়ম নিজের মুক্তির জন্য শওকতের বোনদের কথা ভাবে না। এর আগে যে শিল্পী মারা গিয়েছিলেন তা ঘরেও মরিয়মের ছবি পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে ইঙ্গিত দেওয়া হয় তাদের মধ্যে কোনো না কোনো সম্পর্ক ছিল। সংসার ও সন্তানের অধিকারের লড়াই আপন সম্পর্ককে বিষাক্ত করে তোলে তা দেখানো হয়েছে সাথী-বিথীর ঘটনার মাধ্যমে। এ ছাড়া নারীর চেতনায় দেশপ্রেম নেই। এদের বিপরীতে আনোয়ারা, হামিদা, নবার স্ত্রী পুরষতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ নারীর প্রতীক অর্থে চিত্রায়িত হয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে, জহির রায়হান যখন চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন তখন দেশের পরিস্থিতি উত্তাল। '৬০ এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে বিভিন্ন ঘটনায় আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সরকারের '৫৬ এর সংবিধান বাতিল, রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করা, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কর্মকর্তাদেও বরখাস্তের মতো ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া তিনি সরাসরি ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করে মৌলিক গণতন্ত্র চালু করেন। এরপর ১৯৬২ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা প্রকাশ্যে আন্দোলন শুরু করে। এর আগে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক–সব ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান বৈষম্যের শিকার হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের মানুষ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে (ইসলাম, ১৯৮১)।

এখানে ১৯৬১ সালের নভেম্বরে মুক্তি পাওয়া *কখনো আসেনি* চলচ্চিত্রে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। তরুণরা যখন রাজপথ উত্তাল করে রেখেছে জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে তখন এক তরুণ চিত্রশিল্পী, এক ব্যবসায়ী, তাদের মনস্তত্ব এবং পারিবারিক দায়িত্ব-টানাপোড়েন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বরং ১৯৭০ সালে যখন পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে সে সময়কার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর *জীবন থেকে নেয়া*'র গল্পে। আর ১৯৬৭ সালে নির্মিত *আনোয়ারা*'র গল্প বাংলার গ্রামীণ মুসলিম সংস্কৃতিকে তুলে ধরে।

আবার, জহির রায়হানের রাজনৈতিক দর্শন ছিল মার্কসবাদী। যেখানে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শ্রেণি সংগ্রামের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো বুর্জোয়া শ্রেণির শোষণ থেকে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি। বড় ভাই শহীদুলাহ কায়সারের মার্কসবাদী চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রভাবিত জহির রায়হান কমিউনিস্ট পার্টিও সদস্য হন। বিভিন্ন ঘটনায় আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তিনি রাশিয়ার তাত্ত্বিক ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন (হায়াৎ, ২০০৭)। একদিকে বামপন্থীদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে স্বৈরাচার শাসন ও এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন, ঐতিহাসিক ছয় দফা উত্থাপন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১১ দফা দাবি– এমন একটি অস্থির সময়ে তিনি পক্ষ নেন স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের। চলচ্চিত্র অন্যতম একটি শক্তিশালী মাধ্যম–সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা ও বলশেভিক নেতা লেনিনের এই বক্তব্যকে ধারণ করে প্রথমে সমাজতন্ত্রকে সফল করে তুলতে সাংস্কৃতিক যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতার পক্ষে ছিলেন জহির রায়হান। তবে পরে তিনি গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য চলচ্চিত্রকে বেছে নেন (হায়াৎ, ২০০৭)। তবে সেটিও ঘটে অনেক পরে। এদিকে এ সময়টিতে চীনপন্থী বামদলের এক অংশ অংশ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিশ্বাস করত না আবার কোনো অংশ ভারত- সোভিয়েতের সাম্রাজ্যবাদ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করা চেষ্টা করছিল (আলীম, ২০১৯)। অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে জহির রায়হান যে মতাদর্শকে ধারণ করতেন চলচ্চিত্রে তার উপস্থাপন সেভাবে ফুটে ওঠেনি। তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়েও শ্রমিকের গল্প বলেননি বরং তাঁর চলচ্চিত্রের কেন্দ্রে ছিল শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তিনি সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে তুলে এনেছেন যারা শ্রমিকের নেতৃত্ব দেয়, যারা শ্রমিককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা প্রয়োজনে অধিকারের কথা বলে।

জহির রায়হান কর্তৃক চিত্রায়িত শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি ঔপনিবেশিক আমলের বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণি এখানেও নিজ স্বার্থে সমাজে বিরাজমান অবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়। সেটি মূল্যবোধের ক্ষেত্রে, নারীর ক্ষেত্রে। স্বার্থে আঘাত লাগার আগ পর্যন্ত কোনো ধরনের পরিবর্তনের পক্ষপাতী মধ্যবিত্ত না। সে জন্য প্রতিনিয়ত সে ধনিক শ্রেণির কাতারে ওঠার চেষ্টা করে, সুবিধাভোগী আচরণ তার মধ্যে দেখা যায়। ধর্মকেও মধ্যবিত্ত নিজের সুবিধা মতো ব্যবহার করে। এই বাঙালি মুসলমান সম্পর্কে এক সময় ছফা (১৯৮১) বলেছিলেন, বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমানরা প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্য সব সময় আরবি, ফার্সি, উর্দু–এসব ভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছে। পরে পরিস্থিতির কারণে তারা বাংলাকে গ্রহণ করে। এ ছাড়া ছফা দাবি করেন, মুসলমানরা ভেবেছিল তারাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সেই সঙ্গে এটিও বলেন, বাঙালি মুসলমান নিজের ভালো চিন্তা করতে শেখেনি। অন্যের পরামর্শ মেনে সে জীবন কাটিয়ে দেয়। পরিবর্তনকে সে সহজে গ্রহণ করে না। কোনো ঘটনা বা বিষয়ের প্রেক্ষিতে যুক্তি, মনন কাজে লাগায় না। *কখনো আসেনি* চলচ্চিত্রে সে সময় উপস্থাপন হয়েছে যে সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধর্মীয় গোঁড়ামি ছেড়ে শিল্প, সাহিত্যের দিকে ঝুঁকছে, নারীরা পর্দাপ্রথা থেকে বেরিয়ে আসছেন। কিন্তু এর পরই পরিচালক *আনোয়ারা*'র মতো চলচ্চিত্র পরিচালক নির্মাণ করছেন যেখানে ধর্মীয় মূল্যবোধ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এ চলচ্চিত্রের কাহিনির বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশের নিজস্ব যুক্তি ও চিন্তার অভাব চোখে পড়ে। পাশাপাশি অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার মতো ঘটনা দেখা ঘটে। ফলে আদতে নতুন কোনো পরিবর্তনের ইঙ্গিত জহির রায়হান দিতে পারেন না। তার মুসলমান সত্তার বহিঃপ্রকাশ বারবার ঘুরেফিরে আসে।

১৯৭০ সালে জহির রায়হানের *জীবন থেকে নেয়া* চলচ্চিত্রে জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু এখানেও নেতৃত্ব দেয় শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি। উনিশ শতকের শুরু থেকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এবং এরপর নানা ঘটনা পরিক্রমায় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ–এ সময়কালে শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি নানা প্রক্রিয়া ও আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায় আহমদ (১৯৬৯), রহমান (২০১২) ও আহমদ (২০০৯) আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলোতে। এ ছাড়া বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে বন্দোপাধ্যায় (উদ্ধৃত মন্ডল, ২০১৭: ৩২) এর মতে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একধরনের মুসলমানীয় চেতনার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এই চেতনা পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ও বিশেষ করে মুসলমানদের স্বার্থচিন্তার সুযোগ করে দেয়। এর একটি প্রতিফলন দেখা যায় *জীবন থেকে নেয়া* চলচ্চিত্রে। শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে চলা অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সব ধর্মাবলম্বীর মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কথা বলছে এমন কোনো বিষয় এ চলচ্চিত্রে পাওয়া যায় না। বরং বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের জাতীয়তাবোধ যে আন্দোলনকে সফল করে তুলবে এমন একটি ইঙ্গিত আছে।

এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, মার্কসবাদী জহির রায়হান গণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মার্কসবাদী রুশ নেতা লেনিনের মতকে গ্রহণ করেছিলেন। লেনিন (১৯২৫) সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে ছড়িয়ে দিতে চলচ্চিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। জহির রায়হানও জাতীয়তাবোধের জন্ম দিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু লেনিনের মতো ধর্মকে অগ্রাহ্য করে তিনি এগিয়ে যাননি। সমাজতান্ত্রিক নেতা লেনিন যেমন মনে করতেন দুর্বলরাই ধর্মকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে। তাঁর (১৯০৫/১৯৮২) মতে, শ্রমিকদের ক্রমাগত অর্থনৈতিকভাবে নিপীড়ন করলে সামাজিক ও রাজনৈতিক নির্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক অত্যাচারও শুরু হয়। তাঁর মতে, মানুষ নির্যাতন ও নিঃসঙ্গতার কারণে ধর্মকে আঁকড়ে ধরে এবং শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে নির্যাতিতরা যখন কিছু করতে পারে না তখন তারা ধর্মের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে তারা কখনো নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারে না। এর ফলশ্রুতিতে শাসক শ্রেণিও শোষণ জারি রাখে। আবার এর আগে মার্কস (১৮৯৫) বলে গেছেন, ধর্মের মাধ্যমে পীড়িতের দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। ধর্ম তাদের মধ্যে একধরনের ভ্রান্তিকর সুখ তৈরি করে দেয় এবং নেশাদ্রব্যের মতো মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। দেখা যায়, মার্কস ও লেনিনের ধর্মবিষয়ক এ মতবাদ জহির রায়হান তাঁর চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেননি। আইনজীবী বাবার সন্তান মার্কস এবং উচ্চশিক্ষিত ও বিদ্যালয় পরিদর্শকের সন্তান লেনিন[৭] ধর্ম সম্পর্কে একটি নিজস্ব মতবাদ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু যে সময়ে জহির রায়হান বেড়ে উঠেছিলেন এবং শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়েছিলেন, নির্মিত চলচ্চিত্রে সেই সব বৈশিষ্ট্যের বাইরে তাঁর বের হওয়া সহজ হয়ে ওঠে না।

সে জন্য দেখা যায়, মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাহিনির প্রতি জহির রায়হান গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। তাই ৬০- এর দশকে গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত *আনোয়ারা*'র গল্প মুসলমান মধ্যবিত্তকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলে। তাঁর নির্মাণে বাঙালি হিসেবে মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিচিতি পেয়েছে। এর বাইরে শুধু সাম্প্রদায়িক

[৭]. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় কার্ল মার্কসের পরিবারের কথা উল্লেখ আছে এবং ২০১৯ সালে দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত খলিলউল্লাহ্ কর্তৃক অনূদিত তারিক আলীর লেখা *লেলিনের সাহিত্যপ্রেম ও রুশ বিপ্লব*- এ লেনিনের পরিবার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সম্প্রতির সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া আছে *আনোয়ারা*'র কাহিনির শুরুর দিকে। একদিকে নুরুলের প্রতিষ্ঠানের কেরানি রতীশ সকালের প্রার্থনা করে আর অন্যদিকে নুরুল কুরআন পড়ে। পরিচালকের অন্যান্য চলচ্চিত্র *সোনার কাজল* (১৯৬২), *কাঁচের দেয়াল* (১৯৬৩), *সঙ্গম* (১৯৬৪), *বাহানা* (১৯৬৫), *বেহুলা* (১৯৬৬)- এর মধ্যে *বেহুলা* ছিল মনসামঙ্গল কাব্যের চিত্রায়ন। এ ধরনের মঙ্গলকাব্যে কোনো বিশেষ দেবতা বা দেবী কেন্দ্রিক গল্প থাকে। জহির রায়হান এখানে বাংলা সাহিত্যকে প্রাধান্য দেন ঠিকই, তবে এখানেও ক্ষমতাবানদের সাথে আপস করে, তাদের দয়ায় টিকে থাকার কথাই বলা হয়।

তবে এটিও বলা যায়, জহির রায়হান নিজে শহুরে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি ছিলেন বলে শহুরে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-হতাশা, সংগ্রামের গল্প তিনি অনুভব করতে পেরেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, সমাজে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো শক্তি এ শ্রেণির আছে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে যে সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তবে এ শ্রেণিটি উচ্চবিত্তের কাতারে দাঁড়াতে যতটা আগ্রহী শ্রমিক হয়ে উঠতে ততটা নয়। অর্থাৎ তার আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে, অনাহারে দিনযাপন করলেও সে কৃষক, মজুরের মতো খেটে খাওয়ার কাতারে নিজেকে ফেলতে পারে না। একধরনের অহং তার মধ্যে কাজ করে। নিজের সামাজিক মর্যাদাকে ঠেলে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা সে করে না। ফলে জীবনে একধরনের বিড়ম্বনা তৈরি হয়। পাশাপাশি এটিও বলেছেন আর্থিক নিশ্চয়তা থাকলে মধ্যবিত্ত অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করে না।

জহির রায়হান যখন মধ্যবিত্তের গল্প বলে চলছেন তখন তাঁর অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের সৃষ্টিকর্মে উঠে আসে নিম্নবর্গের সংগ্রামের গল্প। *সারেং বউ* (১৯৬২), *সংশপ্তক* (১৯৬৫) যার উদাহরণ। এ ছাড়া শামসুদ্দীন আবুল কালামের *কাশবনের কন্যা* (১৯৫৪) গ্রন্থের কাহিনি আবর্তিত হয় গ্রামীণ সাধারণ মানুষের জীবনকে ঘিরে। জহির রায়হান চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এ ধরনের গল্প বেছে না নিয়ে নির্বাচন করেছিলেন *আনোয়ারা*'র মতো গল্প। যেখানে নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের গল্প নেই। একটি বা দুইটি নিম্নবিত্তের প্রতিনিধিত্বশীল যেসব চরিত্র আছে তাদের সংগ্রামের কোনো কাহিনি নেই। মধ্যবিত্তের ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে তাদের গল্প ফুরিয়ে যায়। একই কথা বলা যায় *জীবন থেকে নেওয়া*'র ক্ষেত্রেও। এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলো কখনো মধ্যবিত্তের দয়ায়, মধ্যবিত্তের ছায়ায় এগিয়ে চলেছে। চরিত্রগুলোর বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা নেই, দেশপ্রেমের অনুভূতিহীন এসব মানুষ স্বার্থপর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কাহিনির যেখানে মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে কলকারখানার শ্রমিকরা তাদের নায্য দাবি আদায়ে আন্দোলন করছে, সেখানে একটি চরিত্র মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকায় সে নিজেকে শ্রমিক বা নিম্নবর্গেও কাতারে ফেলছে না। বরং শ্রমিক আন্দোলনকে একধরনের অবজ্ঞা করেছে।

অর্থাৎ, অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে শ্রেণি ব্যবধানের মূল বিষয় ধরে তিনটি চলচ্চিত্রে শ্রেণি দ্বন্দ্ব উঠে এসেছে। একজন শহুরে তরুণ শিল্পীর মধ্যে সৃজনীশলতা ও বাস্তবতাকে ধারণ করার ক্ষমতা থাকার পরও সেই শিল্পী অবহেলিত থেকে যায়। তার সৃষ্টি কুক্ষিগত করার ক্ষমতা রাখে ধনিক শ্রেণি। '৬০ এর পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য কাজ করেছে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অসম বিকাশের কারণে মধ্যবিত্ত সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি হতে শুরু করে। এর ফলে চাকুরি থেকে ছাঁটাই, চাকুরি না পাওয়া, শিল্পচর্চা বাদ দিয়ে চাকুরি খোঁজার মতো বিষয় মধ্যবিত্তের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করে। জীবনকে কষ্ট করে বয়ে নিয়ে চলার মধ্যে মধ্যবিত্তকে খুঁজে পাওয়া যায়। এ জন্য নিজেদের টিকিয়ে রাখতে তাদের মধ্যে স্বার্থপর ও আপসকামী মনোভাব চোখে পড়ে। *কখনো আসেনি*'র কাহিনিতে তাই শ্রেণি বিভক্তি চোখে পড়ে, শ্রেণিহীন সমাজের কথা

বলা হয় না। *আনোয়ারা*-তে নুরুলের কর্মচারী নবার সাথে তার সহজ সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টা করা হলেও আদতে তা বড়বাবু-চাকর সম্পর্ক। নবা নুরুলের ছায়ায় ছায়ায় চলে। নুরুলকে বিভিন্ন ঘটনায় সাহায্য করে কিন্তু সে কখনো বন্ধু হয়ে উঠতে পারে না। বন্ধু হয় হামিদার উকিল স্বামী আমজাদ। *জীবন থেকে নেওয়া*'র গল্পে আছে বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত। শিক্ষা ও রোজগারের দিক থেকে সমাজে এই মধ্যবিত্তের অবস্থান ভালো। কৃষক-মজদুরদের নেতৃত্ব দেয় তারা। জহির রায়হান দেখিয়েছেন সমাজে শ্রেণি বিভক্তি প্রয়োজন অনুযায়ী থাকবে। তাঁর নিজ শ্রেণির সম্পর্ক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। এ জন্য মধ্যবিত্ত শিল্প চর্চা করে, চাকরি করে, শাসক শ্রেণির প্রতি অনুগত থাকে প্রতিবাদ না করার মাধ্যমে। এর প্রমাণ জহির রায়হান নিজে। তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন, আর্থিক সংকটের কারণে একসময় তিনি কিছু বাণিজ্যিক ছবি নির্মাণ করেছিলেন। আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়ার পর তিনি *জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্র* নির্মাণের ঘোষণা দেন (হায়াৎ, ২০০৭)।

পরিচালক জহির রায়হানের গল্পে কৃষক, শ্রমিকের পক্ষে অধিকার আদায়ের লড়াই করে মধ্যবিত্ত। *জীবন থেকে নেয়া* চলচ্চিত্রে কারখানার হরতালের দৃশ্যে বিপ্লবী গান চলে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণির অংশগ্রহণ সেখানে নিষ্ক্রিয়। গানের দৃশ্যে প্রতিবার লাঙল কাঁধে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা শ্রমিক চোখে পড়ে। কিন্তু তাদের কোনো তৎপরতা দেখা যায় না। কারণ তারা মধ্যবিত্তের মতো শিক্ষিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নয়। তাই খেটে খাওয়া মানুষের ভাষা একমাত্র মধ্যবিত্ত বুঝতে পারে। তাদেরকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার যোগ্যতা মধ্যবিত্তেরই আছে। মিছিলের প্ল্যাকার্ডে 'কৃষক মজদুর এক হও', 'দুনিয়ার মজদুর এক হও', 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস কর' ইত্যাদি লেখা থাকলেও সেখানে কোনো কৃষক বা মজদুরকে দেখতে পাওয়া যায় না। বস্তুত এখানে শ্রমিক আন্দোলনকে এক ধরনের আবেগীয় ঢঙে তুলে ধরা হয়েছে। জহির রায়হান যেখানে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি ও শ্রেণিহীন সমাজের আর্দশে বিশ্বাসী ছিলেন সেখানে তিনি মধ্যবিত্তের সাথে সক্রিয় শ্রমিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ তুলে ধরেননি। বরং মধ্যবিত্তের মাধ্যমে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন, যেখানে মধ্যবিত্ত তাদের অর্থনৈতিক মর্যাদা বলে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্রে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে বাঙালি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা বলে মনে হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়েই মধ্যবিত্ত দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। সে উপলব্ধি করে দেশ 'আমার', মাটি 'আমার'। এই আমার বলার মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে শ্রেণিবৈষম্য টিকে থাকে। জহির রায়হান মধ্যবিত্তের মাধ্যমে আন্দোলন দেখিয়ে, শ্রেণি বিভাজনকে অক্ষুণ্ন রেখে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। এখানে তিনি তাঁর মস্কোপন্থী আর্দশ অনুযায়ী পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সমস্যার মোকাবিলা করতে চান। তিনটি চলচ্চিত্রের কাহিনিতে রতীশ, নবা, মধু, আনিসের বাড়ির দুই গৃহকর্মীর মতো নিম্নবিত্তের অন্তর্ভূক্ত চরিত্রগুলো কখনো লোভী, স্বার্থপর কিংবা সহজ সরল। তারা বঞ্চনা বোঝে না, দেশপ্রেম বোঝে না। নবার মতো মানুষ সংসারে আরাম করে দুমুঠো খেয়েপরে বাঁচলেই সুখী। আবার আন্দোলনের স্রোতে মধুর মতো অনেকেই গা ভাসিয়ে দেয়। কপালে দুর্ভোগ থাকলে মারাও পড়ে। এভাবে চলচ্চিত্রের কাহিনিতে মধ্যবিত্তের মতো নিম্নবিত্ত মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পারে না।

জহির রায়হানের কল্পনাবিলাসিতা মধ্যবিত্তকেও কল্পনাবিলাসী করে তোলে। শহুরে মধ্যবিত্ত গ্রাম বলতে বোঝে একঅর্থে বিশ্রামের জায়গা। শওকত জীবনের অপূর্ব সমাবেশ অনুভব করতে গ্রামে ছবি আঁকতে যায়। আবার গ্রামে ঘুরলে দেশের অবস্থা বোঝা যায়, দেশকে ভালোবাসার প্রমাণ দেওয়া যায়– এমন একটি সংলাপ *জীবন*

থেকে নেয়া চলচ্চিত্রে আছে। অথচ সেখানে কিন্তু গ্রামীণ জীবনের কোনো সংকট-সমস্যা দেখানো হয় না। শুধু দেশাত্মবোধক গান দিয়ে জহির রায়হান দেশপ্রেম চিত্রায়ন করে ফেলেন। এতে গ্রামীণ সমস্যা কল্পনাতেই থেকে যায়। গ্রামীণ জীবন নিয়ে মধ্যবিত্ত বাস্তববাদী নয়, বরং আবেগী-তাই এখানে তুলে ধরা হয়। আবার *আনোয়ারা*'র মতো চলচ্চিত্রে গ্রামের মুসলমান মধ্যবিত্তের উপস্থাপন তুলে ধরে আর্থিক সংকটহীন জীবন। ভূ-সম্পত্তি, বাড়িঘর, শহুরে চাকরি এসব কিছু প্রকৃত সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যায়। অথচ পাকিস্তান শাসনামলে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা মহাজন ও জোতদারদের আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল আর গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষেরা হয়েছিল নিঃস্ব। ভাসানী (উদ্ধৃত রহমান সম্পা., ১৯৮২: ৭৫৬) -এর সূত্রে জানা যায়, এ আমলে গ্রামীণ কৃষকেরা তাদের কৃষিদ্রব্যের নায্যমূল্য পেত না। তাদের ওপর খাজনা ও করের বোঝা বেড়েই চলছিল। এতে অর্ধাহার ও অনাহারে তারা জীবন অতিবাহিত করছিল। এর বিপরীতে জহির রায়হানের কল্পনাবিলাসী চিন্তা গ্রামীণ পরিবেশ ও অর্থনীতি সম্পর্কে একধরনের ভ্রম তৈরি করে।

এ ছাড়া জহির রায়হানেরর চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আলোচনায় নারীকে একটি আলাদা শ্রেণি হিসেবে পাওয়া যায়। এখানে মধ্যবিত্ত সংস্কার চায়, বিপ্লব করে কিন্তু ক্ষমতাকে নিজের আয়ত্বে রাখতে সমাজকে ভাঙতে চায় না। তাই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত নারীর উপস্থাপনে কোনো পার্থক্য থাকে না। এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নারীরা পুরুষের কারণে সমাজে মর্যাদা পায়। বাইরের পৃথিবীর শোষণ, বঞ্চনা তাদের আলোড়িত করে না। নিজ গৃহে তারা পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সেটি উপলব্দি করার ক্ষমতার তাদের নেই। নারীদের গৃহকর্ম, সন্তান পালন ও স্বামী সেবা-এগুলো আদর্শ নারীর পরিচয়। শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা হয় অন্তরালে থেকে সমাজে পুরুষের সম্মান বাড়াবে অথবা পুরুষ চাইলে অর্থের বিনিময়ে তাকে কিনে ঘরে সাজিয়ে রাখবে। এ ছাড়া নারীর দুনিয়া চার দেয়ালে আবদ্ধ বলে পারিবারিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চলতে থাকে। এ জন্য নারী নিজেই অন্য নারীর প্রতিপক্ষ হয়ে যায়। তখন হত্যাচেষ্টা, অপহরণ–সবই তার পক্ষে সম্ভব দেখানো হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো নারীকে বিপ্লবী হিসেবে চিন্তা করতে পারে না।

অথচ উনিশ শতকের শুরু থেকে পাশ্চাত্যের নারীরা নিজেদের অধিকার নিশ্চিত করতে আন্দোলন শুরু করেন। ৬০-এর দশকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অসমতা দূর করার লক্ষ্যে জোরদার কর্মকান্ড চালিয়ে যায়। কারণ তারা বুঝেছিলেন প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো রাজনৈতিক ও পুরুষতান্ত্রিক (ফ্রিডম্যান, ২০০৩)। উনিশ শতকের শুরুতে নারীরা ভোটের অধিকার পাওয়ার চেষ্টা করেছে, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলেছে। শিক্ষা, সাহিত্য, চিকিৎসা, সাংবাদিকতায় তাদের অংশগ্রহণ বাড়ছিল। এ ছাড়া নারীরা বিপ্লবী সংগঠনের সাথে জড়িয়ে পড়েন, ভারত ছাড় আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি গ্রামগঞ্জের নারীরাও যোগ দেন। তেভাগা আন্দোলনেও তাদের উপস্থিতি আছে (ভট্টাচার্য, ২০১২)। পাকিস্তান আমলে ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে নারীর অংশগ্রহণ চোখে পড়ে। ৬০- এর দশকে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে নারীবাদীরা গড়ে উঠেছিল । কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে ওই দশকে এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রে পূর্ব পাকিস্তানের নারীদের অবস্থান শোচনীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়। যেমন, মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীর শিক্ষার বিষয়টি জহির রায়হান চলচ্চিত্রে উপেক্ষা করে গেছেন। *আনোয়ারা* উপন্যাসে আনোয়ারা শিক্ষিত এবং ভালো

ছাত্রী।[৮] কিন্তু চলচ্চিত্রে এই বিষয়ে কোনো উপস্থাপন নেই। ফলে আনোয়ারার শক্তি জানার সুযোগ দর্শক পায় না। পরিচালক তার গৃহবধূ বা ভালো স্ত্রী রূপটির প্রতি যত মনোযোগ দিয়েছেন, ততটা তার শিক্ষার প্রতি দেননি। ফলে আনোয়ারার কাহিনি হয়ে উঠেছে একজন ভালো স্ত্রী কীভাবে হওয়া যায় তার একটি নমুনা। আবার বিথীর মতো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেয়ে বিয়ের পর সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠে কিংবা আন্দোলনে তার আর কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। কারণ নারীকে অধস্তন, দুর্বল দেখিয়ে জহির রায়হান ক্ষমতাসীন কাঠামো থেকে তাঁর আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ধরে রাখার চেষ্টা করেন।

রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্তের সচতেন হওয়ার কারণ তাদের শিক্ষা। অর্থনেতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষ্যমের ধারা বোঝার মতো বুদ্ধিমান এই শ্রেণি। কৃষক, শ্রমিকের কাছে রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল তারা। এক অর্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিম্নবর্গের সাথে সেতুবন্ধন রচনা করেছে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি বড় অংশ ছিল ছাত্রসমাজ। যারা এ মেলবন্ধনের মূল কারিগর। তারা সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় মুক্তির ব্যাপারে আবেগপ্রবণ ছিল। জহির রায়হানের তাঁর তারুণ্যে এ চলচ্চিত্রগুলো নির্মাণ করেছিলেন। ফলে এই তরুণ সমাজকেই তাঁর গল্পে পাওয়া যায়।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নিজের স্বার্থে শাসক শ্রেণির সাথে আপস করে চলে। ফলে মধ্যবিত্তের জীবনযাপনে নিম্নবর্গের গল্প উহ্য থেকে যায়। জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্তের অধীন হয়ে ওঠে নিম্নবিত্ত। কল্পনা ও আবেগে ভেসে মধ্যবিত্ত অনুভব করতে চায় গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতি। এখানেও থাকে মধ্যবিত্তের আধিপত্য। গ্রামের মানুষের রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে চলচ্চিত্রের কাহিনিগুলোতে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। বরং মধ্যবিত্তের কণ্ঠ কৃষক- মজদুরের কণ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হয়। নিম্নবর্গের ওপর ভর করে ক্ষমতাসীন হয়ে মধ্যবিত্ত তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তাই জহির রায়হানের চলচ্চিত্রের মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিপ্লবী নয়। তবে জাতীয়তাবোধ বা রাজনৈতিক চেতনায় এরা জাগ্রত হয়, সমাজে পরিবর্তন আসে এ শ্রেণির মাধ্যমে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নব্য ক্ষমতাবান শ্রেণি হওয়ার মনোভাব নিয়ে তারা কাজ করে যায়।

[৮] আনিসুজ্জামান সম্পাদিত নজিবর রহমানের *আনোয়ারা* (২০১২) উপন্যাসের পৃষ্ঠা. ৯- এ বলা হয়েছে, আনোয়ারার স্মরণশক্তি খুব ভালো। হাতের লেখাও সুন্দর। সে মেঘনাদবধ কাব্য, পদ্মপাঠ, সীতার বনবাস ইত্যাদি গ্রন্থ লিখে বুঝাতে সক্ষম। এ ছাড়া পড়ার বইয়ের পাশাপাশি সে বাইরের অন্যান্য বইও পড়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

ফলাফল, সুপারিশ ও উপসংহার

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ ফলাফল

মিলস (১৯৫১)- এর মতে, সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণি দুই ভাগে বিভক্ত। পুরেনো মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্তরা তার নিজস্ব মালিকানার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই শ্রেণিভুক্তরা নিজে জমি চাষ করে, ব্যবসা করে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকেরা সব সময় উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করেছেন। এরপর সেখান থেকে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। শিল্পবিপ্লবের পর এখানকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পরিসর বেড়ে ওঠে। আর নতুন মধ্যবিত্তরা সাধারণত অন্যের মালিকানায় উৎপাদনের সাথে জড়িতে থাকে। সেখানকার কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পদের ব্যবস্থাপনা, আমলাতান্ত্রিক কাঠামো ও বিশাল জনগোষ্ঠী নিয়ে কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়। আর এ কারণে এক সময় পুরোনো মধ্যবিত্তদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। নতুন মধ্যবিত্তরা শিক্ষিত, ভালো বেতনের চাকুরি করে এবং ভালো সঞ্চয়ও তাদের থাকে। মার্কস ও এঙ্গেলস (১৮৪৮), ওয়েবার (১৮৭৮) কিংবা রাইট (১৯৭৯)–এর তত্ত্ব অনুযায়ী মধ্যবিত্তের যেসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা '৬০ ও '৭০ দশকে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সুবিধাভোগী, রক্ষণশীল, পরস্পরবিরোধী চাপে অবস্থানকারী, রাজনৈতিকভাবে সচেতনসহ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তারা চিহ্নিত করেছেন। ফলে জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন- এ যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটেছিল ভারতীয় উপমহাদেশের বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেও প্রায় একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

বর্তমান গবেষণায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপায়নে কী বলা হচ্ছে তার সংক্ষেপে হলো, তাঁর চলচ্চিত্রগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। যেখানে বাঙালি হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ঔপনিবেশিক আমলে গড়ে ওঠা এই শ্রেণি পূর্বতন বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে এগিয়েছে। শিক্ষিত, রাজনৈতিকভাবে সচেতন, রক্ষণশীল, সংস্কারাচ্ছন্ন, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন, সুবিধাভোগীসহ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। চলচ্চিত্রগুলোতে শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের কর্তৃত্ব, বুদ্ধিমত্তা, ভালো-মন্দ, অভাব- অভিযোগ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন পরিচালক। কিন্তু নিম্নবিত্তের মানুষের সংগ্রামের গল্পকে গুরুত্ব দেননি। তাদের চরিত্রগুলোকে দুর্বলভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি চেয়েছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে নিম্নবিত্তের প্রতিনিধি করে তুলতে। যার ফলস্বরূপ জহির রায়হান যে নিজস্ব মধ্যবিত্ত মুসলমানি সত্তার বাইরে বের হতে পারেননি সেটি যেমন বোঝা যায় তেমনি তাঁর মতাদর্শ তথা শ্রেণিহীন সমাজের ধারণা যে একধরনের রোমান্টিকতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে তাও বলা যায় । অর্থাৎ, তিনি শ্রেণিবৈষম্য দূর করতে চান, কিন্তু ক্ষমতাবলয়ে থাকতে চাওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির মাধ্যমে।

জহির রায়হানের মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে তার মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিল তা মার্কস ও এঙ্গেলস (১৮৪৮), ওয়েবারের (১৮৭৮) তত্ত্ব মতে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়। তাঁরা যে প্রোলেতায়িতের কথা বলেছেন তা জহির রায়হানের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলোতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন পেশা, কৃষিজীবী–এ ধরনের পেশাজীবীদের দেখানো হয়, যারা শ্রম বাজারে অর্থের বিনিময়ে শ্রম বিক্রি করে বা সেবা দেয়।। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের সুযোগ পায় এবং

মর্যাদাভিত্তিক গোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত হয়। ফলে জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে এই সেবা এবং সম্পদের পার্থক্যের মাধ্যমে সৃষ্ট শ্রেণি হিসেবে ধনিক, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত–তিনটি শ্রেণি উঠে আসে। *কখনো আসেনি*-তে শিল্পী হিসেবে শওকতের মর্যাদা, আবার *আনোয়ারা*-তে নুরুলের মর্যাদা ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। শিল্পী শওকত অর্থাভাবে, মানসিক সংকটে পতিত হয়ে আত্মহনন করে। আর নুরুলের মতো চরিত্র প্রতিষ্ঠানে শ্রম দিয়ে পুরস্কার হাসিল করে। সমাজে সে ভালো অবস্থানে থাকে, সবাই তাকে সম্মান করে। *জীবন থেকে নেয়া*-তেও একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলোকে শ্রমিক শ্রেণির কাতারে যেমন ফেলা যায় না, তেমনি তারা মালিকও হয়ে ওঠে না। ফলে জহির রায়হানের কাহিনির চরিত্ররা ক্ষমতাবলয়ে থেকে শ্রমজীবীর মতো আচরণ করে, বুর্জোয়াদের কাছ থেকে সুবিধা ভোগ করে।

সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণি নির্মাণে তিনি নারীকেও আলাদা শ্রেণি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলোতে গল্প যেমনই হোক, পুরুষ চরিত্রদের পুরুষোচিত মনোভাব সব জায়গাতে বহাল থেকেছে। অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিকতার চাপে নারীরা মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারেনি। তাদের মধ্যকার বুদ্ধিবৃত্তিক, পরিশ্রমী, সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার মতো বিষয়গুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়ার হয়েছে। এর বদলে তাদের গড়ে তোলা হয়েছে নির্ভরশীল ও দুর্বল চরিত্র হিসেবে, যারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো দ্বারা সংজ্ঞায়িত 'ভালো বোন', 'ভালো স্ত্রী' বা 'কূটচালকারী'। এর বিপরীতে পুরুষ চরিত্রগুলো পরিবার প্রধান, সহনশীল, সচেতন ও সমাজে নেতৃত্বদানকারী। চলচ্চিত্রে নারীর এ ধরনের উপস্থাপন সম্পর্কে মালভি (১৯৭৫) বলেন, মূলধারার চলচ্চিত্রগুলো সব সময় একধরনের যৌনতুষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করে। নারীর চিত্রায়নকে কেন্দ্র করে এই সম্ভাব্য তুষ্টি প্রদান করা হয়। এমনভাবে তাকে উপস্থাপন করা হয় যাতে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতর দিয়ে তাকে দেখে তুষ্ট হওয়া যায়। ফলে নারী পর্দার ভেতরের পুরুষ চরিত্রগুলোকে তুষ্ট করার পাশাপাশি পর্দার বাইরের দর্শককেও তুষ্ট করে। এ ক্ষেত্রে একদিকে চলচ্চিত্রের কাহিনির মূলকেন্দ্রে পুরুষ থাকে এবং সে পুরো ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে, যার মাধ্যমে দর্শক নিজেকে খুঁজে পায়। আর অন্যদিকে নারীকে প্রসাধনী, অলংকারসহ নানাভাবে সাজিয়ে যৌন আবেদন সৃষ্টি ও নায়কের প্রতি নির্ভরশীল করে তুলে তাকে দেখনযোগ্য বস্তু হিসেবে তুলে ধরা হয়। ফলে দর্শক নায়কের মাধ্যমে নারীর প্রতি তার অবদমিত ইচ্ছার প্রকাশ দেখতে পায় এবং নারীর প্রতি সেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে অক্রিয় নারীর উপস্থাপন দর্শকের সম্মতি আদায় করে নেয়। জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপন নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্যকে জিইয়ে রেখেছে। পাশাপাশি নারীকে নিয়ে একধরনের বাণিজ্যিকীকরণ লক্ষ করা যায় এবং দৃশ্যদ্রব্য হিসেবেও নারীর উপস্থিতি চোখ পড়ে। *কখনো আসেনি*-তে শওকত চায় মরিয়ম নাচ-গান পারুক, আবার সুলতান চান মরিয়মের সৌন্দর্যকে মূর্তির মতো উপভোগ করতে। আবার *আনোয়ারা* চলচ্চিত্রটির মূল চরিত্র আনোয়ারা হলেও গল্প এগিয়ে যায় নায়ক নুরুলকে ঘিরে। আনোয়ারার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নুরুল 'ভালোবাসার চিহ্ন' হিসেবে আনোয়ার চুলের কিছু অংশ কেটে পকেটে পুরে নেয় । *জীবন থেকে নেয়া*-তে সাথী আর বিথী সাজসজ্জায় পরিপাটি, পুরুষের আজ্ঞাবাহী। অর্থাৎ তিনটি চলচ্চিত্রের কাহিনিতে পুরুষকে ঘিরে গল্প নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং পুরুষ চরিত্রগুলো নারীকে তাদের নিজেদের মতো ব্যবহার করেছে।

অন্যদিকে তিনটি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ন্যারেটিভ বা বর্ণনা দেখার পাশাপাশি এর ভেতরকার ডিসকোর্স অনুসন্ধান করে পাওয়া যায়, সমাজে যে মতাদর্শটি গ্রহণযোগ্য সেটিকে মাথায় রেখে কাহিনি এগিয়ে গেছে। ফলে মধ্যবিত্ত সম্পর্কে দর্শকের মনে অনুধাবন তৈরি হয়। এ বিষয়ে মেজ (১৯৯১) বলছেন, অধিকাংশ ন্যারেটিভের কোনো না কোনো ডিসকোর্স থাকে যার বিশেষত্ব হচ্ছে সেটি কেউ না কেউ তৈরি করে। এসব চলচ্চিত্রে

মধ্যবিত্ত শ্রেণি শিক্ষিত ও পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্বদানকারী, শাসক শ্রেণির কাছাকাছি অবস্থানকারী, সুবিধাভোগীসহ কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়। ঘোষ (২০১৪) যেমন বলেছিলেন, ধনিক শ্রেণির তৈরি করা পথে হাঁটতে গিয়ে শিল্পী, সাহিত্যিক ও মধ্যবিত্তরা তিনটি জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যায়। যার একদিকে আছে হতাশা, আরেকদিকে সমাজতন্ত্র ও অন্যদিকে ফ্যাসিজম। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত শিল্পীদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অনুভূতি থাকা প্রয়োজন আছে। বুর্জোয়া শ্রেণির তৈরি করা অর্থের সম্পর্কের কারণে শিল্পী এ কথা ভুলে গিয়ে মুনাফা অর্জনে ব্যস্ত হয়ে স্বাতন্ত্র্যতা হারিয়ে ফেলে। এর পরিণতিতে শিল্পীর বিপ্লবী চেতনা কল্পনাতেই থেকে যায়। ঘোষের (২০১৪) কথার প্রতিচ্ছবি জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে ফুটে ওঠে।

ভাষা, ইমেজের মাধ্যমে যে শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে জহির রায়হান নির্মাণ করেছেন তারা সমাজে সমতা সৃষ্টি বা বৈষম্য দূর করার বিপ্লবী চেতনা ধারণ না করে ক্ষমতাসীনদের ছায়াতলে টিকে থাকার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে। উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন ধ্যবিত্ত–তিনটি রূপেই এই শ্রেণিকে সংঘাত ও সংগ্রামে তখনই উপনীত হতে দেখা যায় যখন তার স্বার্থে আঘাত লাগে। তবে এখানেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি পুরোপুরি শাসক শ্রেণির নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। কারণ সমাজের মর্যাদাবান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে হলে তাকে এদের অধীনস্ত হতে হবে। নচেৎ সমাজে কেউ সম্মান দেবে না। আর এই সম্মানের কথা ভেবে এই শ্রেণি প্রয়োজনবোধে খেটে খাওয়া কৃষক বা মজুরের কাজ করতে অপরাগ থাকে। এভাবে সামাজিক চর্চায় যুক্ত প্রচলতি ধারণাগুলো চলচ্চিত্রগুলোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি বার্থ (১৯৫৭) কর্তৃক আলোচিত ইমেজ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে '৬০ থেকে '৭০- এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে অর্থনৈতিক দিক থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য, পরিবার ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের জায়গাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে স্বচ্ছল ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের শিল্পের প্রতি আগ্রহ, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় অনুশাসন ও গোঁড়ামি থেকে নারীদের বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা তুলে ধরা হয়। আবার নিম্নবিত্তের প্রতি সমাজে প্রচলিত মনোভঙ্গি এবং নারীকে দুর্বল ও নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের মতো বিষয় চোখে পড়ে।

এদিকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নির্মিত চলচ্চিত্র সম্পর্কে তত্ত্ব দিয়েছিলেন আফ্রিকীয় চলচ্চিত্রতাত্ত্বিক তেশম গ্যাব্রিয়েল। তাঁর (উদ্ধৃত আল- মামুন, ২০১৪) মতে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বিপ্লবী বা রাজনৈতিক চলচ্চিত্রগুলো যা তৃতীয় সিনেমা[৯] হিসেবে পরিচিত সেগুলো উপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির কথা বলে ও মৌলিক চিন্তাকে উন্নত করে। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাতে নতুন চলচ্চিত্রিক ভাষা তৈরির সুযোগ করে দেয়। গ্যাব্রিয়েলের এই তত্ত্বের সাথে নির্বাচিত জহির রায়হানের চলচ্চিত্রগুলোর বার্তার সে অর্থে সঙ্গতি পাওয়া যায় না। তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায়, গ্যাব্রিয়েল বলেছিলেন ফরাসি তাত্ত্বিক ফ্যানোর (১৯৬১) তত্ত্বের মতো তিনিও মনে করেন, ঔপনিবেশিক শাসন আমলের একটি পর্যায়ে শিল্পীরা ক্ষমতাসীনদের পক্ষে কথা বলে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে শিল্পী নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করে। কারণ শাসকদের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ততদিনে সে নিজের মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। তাই অতীত স্মৃতিচারণের মাধ্যমে নিজের শেকড়কে খুঁজে ফেরে। সবশেষে নিজের সমাজ, সংস্কৃতি ও

[৯] আর্জেন্টিনার চলচ্চিতত্রকার ফার্নান্দো সোলানাস ও অক্টাভিও গেটিনোর প্রবন্ধ *টুওয়ার্ড এ থার্ড সিনেমা*-তে থার্ড সিনেমা বা তৃতীয় সিনেমার উল্লেখ আছে। তাঁরাই প্রথম তৃতীয় সিনেমার ধারণা দেন।

মানুষের সাথে মিশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাকে সংগ্রামী পর্যায়ে উন্নীত করে। তার সৃষ্টিকর্মে তখন বিপ্লবী ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফ্যানোর (১৯৬১) এই তত্ত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে ওঠেন জহির রায়হান।

পরিচালক জহির রায়হান তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের শুরুর দিকে *কখনো আসেনি* (১৯৬১), *সোনার কাজলের* (১৯৬২), *কাঁচের দেয়াল* (১৯৬৩)- এর মতো কিছু সামাজিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। যেখানে মধ্যবিত্তের গল্প পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে সে সময়কার উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়টির আঁচ পাওয়া যায় না। হায়াৎ (২০০৭) এর সূত্রে জানা যায়, এ চলচ্চিত্রগুলো তেমন সফল না হওয়ায় জহির রায়হান অর্থাভাবে বাণিজ্যিক ছবি নির্মাণ শুরু করেন। ফলে শাসকগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে জহির রায়হান নির্মাণ করেন *সঙ্গম* (১৯৬৪), *বাহানা* (১৯৬৫) এর মতো চলচ্চিত্র। এরপর একসময় অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হলে তিনি নিজের সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। *বেহুলা* (১৯৬৬) ও *আনোয়ারা* (১৯৬৭)–এর মতো দেশীয় লোকগাঁথা এবং উপন্যাসভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। সবশেষে জাতীয়তাবাদের উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০) চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেন। জহির রায়হান সম্পর্কে একই দাবি করেন গবেষক জুনাইদ (২০১৬)।

অতএব, পরিচালকের উত্থান ফ্যানো এবং গ্যাব্রিয়েলের তত্ত্ব অনুযায়ী হলেও মার্কসবাদী ও সোভিয়েতপন্থী চিন্তাধারার জহির রায়হান নির্মিত চলচ্চিত্রের মধ্যবিত্ত শ্রেণি ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে ক্ষমতাসীনদের পক্ষে কাজ করে গেছে। ফলে নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলোতে শ্রেণিহীন সমাজ বা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত ইচ্ছা বা আলোচনা এখানে উঠে আসেনি।

এই পর্যায়ে বলা যায়, শিক্ষা, অর্থ, প্রতিপত্তি–এ ধরনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে মধ্যবিত্ত অনেক সময় এলিটদের কাতারে পড়ে, যাদের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী শ্রেণি বলে দাবি করেন সেন (২০০২)। তাঁর মতে, সংস্কৃতির নির্মাণে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা আছে। বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞায় গ্রামসি (২০১১) বলেছেন, জাতিকে নৈতিকতা ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার কাজটি যারা করেন তারাই বুদ্ধিজীবী। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা কাজ করেন। এর মাধ্যমে মতাদর্শিক হেজিমনি বা আধিপত্য তৈরি করেন। বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর একধরনের স্বাতন্ত্র্যতা আছে। এদের এক একজন একেকটি ক্ষেত্র বা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকে। সুতরাং জহির রায়হানের মতো একজন প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব যিনি একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্যকার ও প্রযোজক ছিলেন, তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোতে থাকা বার্তা সমাজ ও সংস্কৃতির নির্মাণে ভূমিকা রাখে। নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলোর মাধ্যমে শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তিনি তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্তকে নেতৃত্বদানকারী হিসেবে তুলে ধরেছেন। এই শ্রেণির মাধ্যমে তিনি সমাজে সমতা আনার চেষ্টা করেছেন। নিম্নবিত্তকে পাশ কাটিয়ে শাসকশ্রেণির পাশে থেকে কাজ করে যাওয়ার আলোচনা স্পষ্ট করে তুলেছেন তিনি।

৫.২ সীমাবদ্ধতা ও সুপারিশ

জহির রায়হানের চলচ্চিত্র নিয়ে বেশকিছু গবেষণা হয়েছে। তবে তাঁর চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপায়নের ডিসকোর্স বিশ্লেষণ সংক্রান্ত গবেষণা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ গবেষণার মাধ্যমে জহির রায়হানের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও শ্রেণি ঝোঁক সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপায়নের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্য এবং পরিচালকের মতাদর্শের কতটুকু প্রতিফলন চলচ্চিত্রে ঘটেছে বা ঘটেনি তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। অর্থাৎ, জহির রায়হান তাঁর চলচ্চিত্রে শ্রেণিকে কীভাবে নির্মাণ করেছেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে

কী আলোচনা করেছেন–এ গবেষণায় তার উত্তর উঠে এসেছে। জহির রায়হানের চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সংক্রান্ত এই গবেষণা আরও একটি সংযোজন হয়ে উঠবে।

তবে যেকোনো গবেষণার করার সময় নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়। এই গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মূল সীমাবদ্ধতা হলো নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলোর ভালো প্রিন্ট পাওয়া। পুরোনো চলচ্চিত্র হওয়ায় চলচ্চিত্রগুলোর প্রিন্ট তেমন ভালো ছিল না। সংলাপ কিছু জায়গায় অস্পষ্ট শোনা গেছে। কিছু জায়গায় ইমেজও পরিষ্কার না। ফলে সর্তকতা অবলম্বন করে সংলাপ সংগ্রহ করা হয়েছে। ইমেজ বিশ্লেষণের জন্য ছবি সংগ্রহের ক্ষেত্রে পুরোপুরি অস্পষ্ট ইমেজগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। আবার সংগ্রহের পর কোনো কোনো ইমেজ বেশি কালো দেখা গেছে। এতে ইমেজগুলো দেখতে কিছুটা সমস্যা মনে হতে পারে।

এ গবেষণার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রগুলোর সিনেমাটোগ্রাফি, সাজসজ্জা–এ ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার সুযোগ হয়নি। ভবিষ্যতের গবেষকেরা এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন।

৫.৩ উপসংহার

সেন (২০০২) বলেন, কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর জন্ম, তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম, ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষষের মাধ্যমে সেই গোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একধরনের ছাঁচ তৈরি হয়। সেই ছাঁচে অভ্যস্ত হতে হতে এমন একটি সময় আসে যখন মানুষ নিজের অজান্তে তাকে প্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু এই ছাঁচের বাইরে বের হতে না পারলে পরিবর্তন যেমন সম্ভব হয়ে ওঠে না, তেমনি চারপাশের পরিবর্তনও চোখে পড়ে না। জহির রায়হান নির্মিত চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কিত আলোচনা একধরনের ছাঁচে পড়ে যায়। ফলে একজন খেটে খাওয়া মজদুরও যে তার ভাগ্য বদলাতে পারে, আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারে তা এসব গল্পে বলা হয় না। তাই বলা যায়, এ গবেষণার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণি রূপায়নের আলোচনায় জহির রায়হান তাঁর শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত সত্ত্বাকে জিইয়ে রেখেছেন। নিজের মতাদর্শকে তিনি রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ব্যবহার করলেও চলচ্চিত্রের মতো একটি শক্তিশালী মাধ্যমে তিনি তার প্রতিফলন ঘটাতে পারেননি। ফলে তাঁর সমাজতান্ত্রিক চেতনার সাথে ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণিবিষয়ক আলোচনা সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে।

তবুও একজন শিল্পী জহির রায়হানের সৃষ্টি সমাজ বিকাশের ধারায় অবদান রাখতে সক্ষম। তাঁর চলচ্চিত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি নির্মাণের যে ডিসকোর্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বাইরে বেরিয়ে নিম্নবিত্ত বা শ্রমিক শ্রেণির ডিসকোর্স নির্মাণ করতে পারলে শ্রেণিহীন সমাজের বার্তা তুলে ধরা সম্ভব হওয়ার পাশাপাশি মানবতার গল্প উপস্থাপিত হতো।

তথ্যসূত্র

- Akhter, F. (2014). Jibon Thekey Neya (Glimpses Of Life, 1970): The First Political Film in Pre-liberation Bangladesh and A Cinematic Metaphor For Nationalist Concerns. *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.)*, 59(2), 291-303. Retrieved from https://www.asiaticsociety.org.bd/3_867_Fahmida_Dec_14.pdf
- Alam, T. (2019, August 29). An in-depth look into the film "Kokhono Asheni". *BD Flims*. Retrieved from https://www.bdfilms.info/2019/08/an-in-depth-look-into-film-kokhono.html
- Barthes, R. (1957). *Mythologies*. (A. Lavers, Trans.). New York, USA: The Noonday Press.
- Bottomore, T. (1975). *Marxist Sociology*. UK: MacMillan Publishers.
- Burck, C. (2005). Comparing Qualitative Research Methodologies for Systemic Research: The Use of Grounded Theory, Discourse Analysis and Narrative Analysis, *Journal of Family Therapy*, 27, 237- 262. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/j.1467-6427.2005.00314.x.pdf
- Chandler, D. (2002). *The Basics Semiotics*. New York, USA: Routledge.
- Davis, K. & Moore, W. E. (1945). Some Principles of Stratification. *American Sociological Review*, 10 (2), 242- 249. Retrieved from https://web.ics.purdue.edu/~hoganr/SOC%20602/Spring%202014/Davis%20and%20Moore%201945.pdf
- Delanty, G. (2000). Defining the Possible and Impossible. *Modernity And PostModernity: Knowledge, Power and the Self*. London, UK: SAGE Publications Ltd.
- Fanon, F. (1963). *The Wretched of the Earth* (R. Philcox, Trans.). New York, USA: Grove Press.
- Firdaus, I. (2017). Representation of Metropolitan Psyche in Zahir Raihan's Minimalist Film Kokhono Asheni. *ReviewEssays*. Retrieved from https://www.reviewessays.com/essay/Representation-of-Metropolitan-Psyche-in-Zahir-Raihans/79041.html
- Foucault, M. (1977). *Discipline And Punish: The Birth of the Prison*. (A. Sheridan, Trans.). New York, USA: Random House Inc. Retrieved from https://monoskop.org/images/4/43/Foucault_Michel_Discipline_and_Punish_The_Birth_of_the_Prison_1977_1995.pdf
- Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality: An Introduction*. (R. Hurley, Trans.). New York, USA: Random House Inc. Retrieved from https://suplaney.files.wordpress.com/2010/09/foucault-the-history-of-sexuality-volume-1.pdf

- Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. New York, USA: Bloomsbury.
- Fredman, E. B. (2003). *No Turning Back : The History of Feminism and the Future of Women*. New York, USA: Ballantine Books.
- Giddens, A. (2006). *Sociology* (5th ed.). Cambridge, UK: Polity Press.
- Genette, G. (1972). *Narrative Discourse: An Essay In Method*. (J. E. Lewin, Trans.). New York, USA: Cornell University Press.
- Gramsci, A. (2011). *Prison Notebooks*. New York, USA: Columbia University Press. Retrieved from http://burawoy.berkeley.edu/Reader.101/Gramsci.Prison.I.pdf
- Hall, S. (1992). The West and The Rest. In B. Gieben, & S. Hall. (ed.). *Formations of Modernity: Understanding Modern Societies an Introduction Book 1*. Cambridge, UK: Polity Press. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/25bd/7a7d8e9371f3816b63fab5a03b2aff23ba34.pdf
- Hall, S. (1997). The Work of Representation. *Representation Cultural Representations and Signifying Practices.*London, UK: SAGE Publication Ltd. Retrieved from https://fotografiaeteoria.files.wordpress.com/2015/05/the_work_of_representation__stuart_hall.pdf
- Hossain, N. (2018, May 17). Kokhono Asheni: A Case Study. *DhakaTribune*. Retrieved from https://www.dhakatribune.com/magazine/2018/05/17/kokhono-asheni-a-case-study
- Islam, R. (2019, July 11). Symbolism, Power and Nationalism in Jibon Theke Neya (1970). *BD Fims*. Retrieved from https://www.bdfilms.info/2019/07/symbolism-power-and-nationalism-in.html
- Lenin, V. (1925). *Directives on the Film Business*. Retrieved from http://soviethistory.msu.edu/1924-2/socialist-cinema/socialist-cinema-texts/lenin-on-the-most-important-of-the-arts/
- Marx, K. (1843). *A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right*. Deutsch-Französische Jahrbücher. Retrieved from https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm#05
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *Manifesto of the Communist Party*. Retrieved from https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf
- Matthews, B., & Ross, L. (2010). *Research Methods A Practical Guide for the Social Sciences*. Essex, England: Pearson Education Limited.

- Merriam-Webster Dictionary. (n.d.). Merriam-Webster. Retrieved from https://www.merriam-webster.com/dictionary/offbeat
- Metz, C. (1991). *Film Language: A Semiotics of the Cinema*. (M. Taylor, Trans.). Chicago, USA: The University of Chicago Press.
- MaCully, M. (2020, October 21). *Pablo Piccaso*. Retrieved from https://www.britannica.com/biography/Pablo-Picasso#info-article-history
- Mills, C. W. (1951). *White Coller: The American Middle Class*. UK: Oxford University Press.
- Mulvey, L. (1975). *Visual Pleasure and Narrative Cinema*. Retrieved from http://www.columbia.edu/itc/architecture/ockman/pdfs/feminism/mulvey.pdf
- Onega, S., & Landa, J. A. G. (Ed.). (1996). *Narratology: An Introduction*. New York, USA: Routledge.
- Propp, V. (1928). *Morphology of the Folktale*. (L. A. Wagner, Trans.). Austin, USA: University of Texas Press. Retrieved from https://monoskop.org/images/f/f3/Propp_Vladimir_Morphology_of_the_Folktale_2nd_ed.pdf
- Pollard, A. F. (2008). *Factors in Modern History*. Riverbend Court Burnaby, Canada: Mitchell Press.
- Prince, G. (1982). *Narratology: The Form and Functioning of Narrative*. Berlin, Germany: De Gruyter Mouton.
- Prince, G. (1995). On Narratology: Criteria, Corpus, Context. *Narrative*, 3(1), 73-84. Columbus, USA: Ohio State University Press. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/20107044
- Rose, G. (2001). *Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials*. London, UK: SAGE Publications. Retrieved from http://www.miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/2001_Rose_Visual_Methodologies_book.pdf
- Rabinow, P. (ed.). (1991). *The Foulcault Reader: An Introduction to Foulcault's Thought*. London: Penguin. Retrieved from https://monoskop.org/images/f/f6/Rabinow_Paul_ed_The_Foucault_Reader_1984.pdf
- Sassure, F. d. (1966). Course in General Linguistics. In C. Bally, A. Sechehaye, & A. Riedlinger. (ed.), (W, Baskin. Trans.). USA: The Philosophical Library Inc. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/CourseinGeneralLinguistics_10009049.pdf
- Todorov, T. (1991). The 2 Principles of Narrative. *Diacritics*, 1(1), 37-44. doi: 10.2307/464558.
- Thwaites, T., Davis, L., & Mules, W. (1994). *Tools for Cultural Studies: An Introduction*. London, UK: Macmillan Education.

- The University of Luxembourg's CVCE. (2016). *The Cold War (1945-1989)*. Retrieved from http://www.cvce.eu/obj/the_cold_war_1945_1989_full_text-en-6dfe06ed-4790-48a4-8968-855e90593185.html
- Waters, T., & Waters, D. (2010). The New Zeppelin University Translation of Weber's 'Class, Status, Party'. *Journal of Classical Sociology*, 10(2), 137–152. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/292414868_The_distribution_of_power_within_the_community_Classes_stande_parties_by_max_weber
- Wimmer, R.D., & Dominick, J. R. (2011). *Mass Media Research* (9th ed.). California, USA: Wadsworth.
- Wodak, R. (1996). *Disorders of Discourse*. London, UK: Longman.
- Wright, E. O. (1979). *Class Structure and Income Determination*. New York, USA: Academic Press Inc.
- আরমান, জাহিদুর রহমান (২০১৪)। জাতীয় চলচ্চিত্র হিসেবে 'জীবন থেকে নেয়া': একটি সেমিওটিক বিশ্লেষণ। *বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, ৭ (৭), ৯৯-১০৩। ঢাকা: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ।
- আল-মামুন, ইউসুফ (২০১৪)। তৃতীয় সিনেমা: রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগরণের হাতিয়ার। *শিল্প ও শিল্পী*, ৭ (২)। নেওয়া হয়েছে shorturl.at/etHNS
- আলী, খন্দকার সাখওয়াত (২০২০, নভেম্বর, ১০)। ধাপে ধাপে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটছে। *বণিকবার্তা*। নেওয়া হয়েছে shorturl.at/ftQ29
- আলীম, মোঃ আবদুল (২০১৯)। *বাংলাদেশে চীনপন্থী বামধারা রাজনীতি*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।
- আহমদ, কামরুদ্দীন (২০০৯)। *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*। ঢাকা: ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন।
- আহমদ, সহুল (২০২০)। *জহির রায়হান মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনৈতিক ভাবনা*। ঢাকা: গ্রন্থিক প্রকাশন।
- আহমদ, সহুল (২০১৯, আগস্ট ২০)। জহির রায়হানের ছোটগল্প : মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিত্র ও তার সময়। *পরস্পর*। নেওয়া হয়েছে shorturl.at/quBLM
- আহমেদ, সরাফ (২০১৯, নভেম্বর ৯)। বার্লিন প্রাচীর: ৩০ বছরেও মনস্তাত্ত্বিক দেয়াল পুরো ভাঙেনি। *দৈনিক প্রথম আলো*। নেওয়া হয়েছে https://www.prothomalo.com/opinion/article/1623466
- আহমদ, আবুল মনসুর (১৯৬৯)। *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*। ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল।
- ইসলাম, রফিকুল (১৯৮১)। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে: এ টেল অব মিলিয়নস। ঢাকা: ছায়াপথ প্রকাশনী।
- উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৬)। *মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।
- কবির, আলমগীর (২০১৮)। ইন আ.খ.ম আতিকুজ্জামান ও প্রিয়ম প্রীতি পাল (সম্পা.), *চলচ্চিত্র ও জাতীয় মুক্তি* (ভলিউম. ১), (পৃ. ১৫০-১৫২)। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

- করিম, এ.কে. নাজমুল (২০০৯, এপ্রিল ২৩)। মুসলিম অভিজাত ও মধ্যবিত্ত। *বঙ্গরাষ্ট্র*। নেওয়া হয়েছে https://www.bangarashtra.net/article/422.html
- খান, মো. ফাহিম (২০২০, জানুয়ারি ৯)। গুয়ের্নিকা: যুদ্ধের হিংস্রতাকে তুলির আঁচড়ে বন্দি করতে পিকাসোর ভয়াল প্রয়াস। *রোরমিডিয়া*। নেওয়া হয়েছে https://roar.media/bangla/main/art-culture/guernica-a-bold-portrayal-of-war-ridden-misery-by-pablo-picasso
- গায়েন, কাবেরী (২০১৩)। *মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী- নির্মাণ*। ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশনস।
- ঘোষ, বিনয় (১৯৬৮)। *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*। ঢাকা: বুক ক্লাব।
- ঘোষ, বিনয় (২০১৪)। *শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ*। কলকাতা: প্রকাশ ভবন।
- চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (২০২০, জুলাই ১৪)। বাঙালি মধ্যবিত্তের ভালো-মন্দ। *দৈনিক দেশরূপান্তর*। নেওয়া হয়েছে https://www.deshrupantor.com/editorial-news/2020/07/14/231873
- চৌধুরী, মাহমুদা (২০১৬)। কখনো আসেনি: ঘুম ভাঙানিয়া চলচ্চিত্র। *বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, ৯ (১০), ৫১-৬২। ঢাকা: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ।
- চৌধুরী, মাহমুদা ও কণা, আয়শা আকতার (২০১৭)। *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র: সমাজ ভাবনা*। ঢাকা: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ।
- ছফা, আহমদ (১৯৮১)। *বাঙালি মুসলমানের মন*। ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি।
- জহির, আমিনুল ইসলাম (২০০৯)। জহির রায়হানের চলচ্চিত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রসঙ্গ। *বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, ২(২), ২৩-৩০। ঢাকা: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ।
- জাকারিয়া, এ কে এম (২০১৮, নভেম্বর ২০)। পিকাসোর গুয়ের্নিকা। *কিশোর আলো*। নেওয়া হয়েছে shorturl.at/cqvzW
- জুনাইদ, নাদির (২০১৬, এপ্রিল ৩)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের ব্যক্তব্য ও নির্মাণশৈলী। বিডিনিউজ২৪.কম। নেওয়া হয়েছে https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/35472
- তালুকদার, জাকির (২০১৯, জানুয়ারি ১১)। জহির রায়হান: কৈফিয়তের দায়ভার। *দৈনিক সমকাল*। নেওয়া হয়েছে https://samakal.com/todays-print-edition/tp-kaler kheya/article/19011971
- তুষার, সারোয়ার (২০১৯)। কোয়ারেন্টাইন স্টেট। *অরাজ*। নেওয়া হয়েছে shorturl.at/cdhiI
- তুহিন, ফজলুল হক (২০১৮, নভেম্বর ৬)। শিল্প সাহিত্য চর্চা ও জীবনের প্রতি দায়ভার। *দৈনিক নয়া দিগন্ত*। নেওয়া হয়েছে shorturl.at/iADJS
- দাস, প্রদীপ (২০১৭)। জাতীয়তাবাদের মোড়কে ক্ষমতাবানের জয়গানে জহির। *ম্যাজিক লণ্ঠন*, ১৩ (৭), ১০৩-১১৮।
- নাসরীন, গীতি আরা ও হক, ফাহমিদুল (২০০৮)। *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প সংকটে জনসংস্কৃতি*। ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী।
- পারভীন, আফরোজা (২০১৯)। চলচ্চিত্রে জহির রায়হানের বিষয়বস্তু। *নতুন দিগন্ত*, ৭ (৪), ১০৮-১২৫।

- পান্ডা, বিশ্বজিৎ (২০১৮, এপ্রিল ২০)। মধ্যবিত্তরা কোথায় গেল?। *আজকাল*। নেওয়া হয়েছে https://aajkaal.in/news/editorial/where-did-the-middle-class-go--d143
- বশীর, মুর্তজা (২০২০, ফ্রেবুয়ারি ৪)। জীবন ও শিল্প। *দৈনিক যুগান্তর*। নেওয়া হয়েছে shorturl.at/fwN35
- বটোমোর, টম (১৯৭৫)। *মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব*। (হিমাংশু, ঘোষ, অনূ.)। কলকাতা: আরিন প্রিন্টার্স।
- ভূইয়া, আবুল হোসাইন (তারিখবিহীন)। মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪) জীবন ও দর্শন। *কালি ও কলম*, ৫৬-৬৪।
- ভট্টাচার্য, মোনালিসা (২০১২)। নারী ও নারী জাগরণ: ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা। *প্রতিধ্বনি- এ জার্নাল অভ হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স*, ১ (২), ২৮৫-২৮৮। নেওয়া হয়েছে https://www.thecho.in/files/Nari-O-Nari-Jagoron--Bharotio-Rajnoitik-Prekkhite-Porjalochona.pdf
- মজিদ, পিয়াস (২০২০, ডিসেম্বর ৭)। জীবনের জয়গান ও জহির রায়হান। *প্রথম আলো*। নেওয়া হয়েছে shorturl.at/asNYZ
- মন্ডল, সেলিমুদ্দিন (২০১৭)। ঔপনিবেশি ভারতে মুসলিম 'জাতি চেতনা' ও রাজনীতি। *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোস্যাল সাইন্স স্টাডিজ*, ৩(৪), ২৯- ৩৯।
- মামুন, বেলায়েত হোসেন (২০১৬)। *চলচ্চিত্রের সাথে বোঝাপড়া*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।
- মাহমুদ, জাহিদ হাসান (২০১৭)। ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্র। *ম্যাজিক লণ্ঠন*, ৭ (১২), পৃষ্ঠা নম্বরবিহীন। নেওয়া হয়েছে shorturl.at/oqHQS
- মিত্র, প্রীতি কুমার (১৯৯৭)। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস। ইন সালাউদ্দিন আহ্মদ, মোয়েম সরকার ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস* (১৯৪৭-১৯৭১) (পৃ. ১৭-৮২)। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
- রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পা.)। (১৯৮২)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: প্রথম খণ্ড*। ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স।
- রহমান, মোহাম্মদ নজিবর (২০১২)। *আনোয়ারা*। ইন আনিসুজ্জামান (সম্পা.)। ঢাকা: অ্যার্ডন।
- রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
- রহমান, মতিন (২০১৭)। জহির রায়হানের শিল্প ভাষায় আনোয়ারা। *বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, ১০ (১২), ৮৫-৯১।
- রহমান, স্নিগ্ধ (২০১৬, আগস্ট ১৯)। জীবন থেকে নেয়া: গল্প হলেও সত্যি। *মুখ ও মুখোশ*। নেওয়া হয়েছে http://mukhomukhosh.net/2016/08/19/jibon-theke-neya/
- রাজু, জাকির হোসেন (১৯৯০)। *চলচ্চিত্রের চালচ্চিত্র*। ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী।
- রায়হান, জহির (২০১৭, জুন ৪)। অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র। *সাপ্তাহিক একতা*। নেওয়া হয়েছে http://www.weeklyekota.net/?page=details&serial=3929
- রায়হান, জহির (১৯৯৮)। *উপন্যাস সমগ্র*। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।

- রায়হান, জহির (২০১৩)। ভূমিকা। ইন শাহরিয়ার কবির (সম্পা.), *একুশে ফেব্রুয়ারি* (পৃ. ৭-১৬)। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।
- রায়হান, জহির (১৯৯৮)। ভূমিকা। ইন মোহাম্মদ হান্নান ও আরজুমন্দ রানু (সম্পা.), *উপন্যাস সমগ্র* (পৃ. ৫-১৪)। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।
- রাজু, জাকির হোসেন (১৯৯০)। *চলচ্চিত্রের চালচিত্র*। ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী।
- রায়, মৃত্যুঞ্জয় (২০১৮)। জহির রায়হান। *ইউটিউব*। নেওয়া হয়েছে https://www.youtube.com/watch?v=TNlgKE6-nyU
- রিয়াজ, আলী (২০১৮, জানুয়ারি ১০) । নতুন মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক ভূমিকার অবসান?। *দৈনিক প্রথম আলো*। নেওয়া হয়েছে https://www.prothomalo.com/opinion/article/1405536
- লেনিন, ভ্লাদিমির ইলিচ (১৯৮২)। *সমাজতন্ত্র ও ধর্ম* । প্রগতি প্রকাশন: মস্কো।
- হক, কাজী ইমদাদুল (২০১৮)। *আবদুল্লাহ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
- হল, স্টুয়ার্ট (২০১৫)। *রেপ্রিজেন্টেশন*। (ফাহমিদুল, হক অনূ.)। ঢাকা: সংহতি প্রকাশন।
- হায়াৎ, অনুপম (২০০৭)। *জহির রায়হানের চলচ্চিত্র পটভূমি বিষয় বৈশিষ্ট্য*। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ।
- হাননান, মোহাম্মদ (২০১৩)। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-১৯৭১)। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
- হায়দার, মনি (২০১৩)। 'কখনো আসেনি' জহির রায়হানের অসমান্য কীর্তি। *বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, ৬ (৬), ১১-১১৭।
- হোসেন, নভেরা (তারিখবিহীন)। বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের শ্রমবিভাজন একটি লিঙ্গীয় মতাদর্শ। *বিএনপিএস*। নেওয়া হয়েছে https://www.bnps.org/journal/19/Gender%20in%20reproductive%20work.pdf
- শাওন, মাহমুদ (২০১৮, আগস্ট ১৯)। আমাদের জহির রায়হান। *সিলেটটুডে২৪.কম*। নেওয়া হয়েছে https://www.sylhettoday24.news/news/details/Feature/62993
- সেন, ড. রংগলাল (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশনন্স।
- সেন, সৌমেন (২০০২)। মধ্যবিত্তের লোকসংস্কৃতি। *চতুরঙ্গ*, ৬ (১), ৫-১৩। কলকাতা: ইম্প্রেশন হাউজ। নেওয়া হয়েছে http://crossasia-repository.ub.uni-heidelberg.de/2370/1/CHATURANGA_VOL_62_NO_1.pdf
- সেলিম, মুজাহিদুল ইসলাম (২০১৫, নভেম্বর ১৬)। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমাচার। *দৈনিক ইত্তেফাক*। নেওয়া হয়েছে http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/sub-editorial/2015/11/16/83841.html
- সুফিয়ান, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ (২০১৮)। বাংলা ভাষা: উৎসের দিকে। ইন মোশাররফ হোসেন খান (সম্পা.)। *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান* (পৃ. ১০৮)। ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
- স্যানাল, অর্ণব (২০১৯, মার্চ ১৪)। সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কী?। *দৈনিক প্রথম আলো*। নেওয়া হয়েছে https://www.prothomalo.com/opinion/article/1583347